মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

শ্রী সুমথনাথ ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর

শরৎ-সাহিত্য-ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকাতা—৪

প্রথম মুদ্রণ
১৩৫৭

এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস:
৭১।এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কুমারী রুমা ঘোষকে

দিলুম—

"ছোটকাকা"

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী চিত্রিত
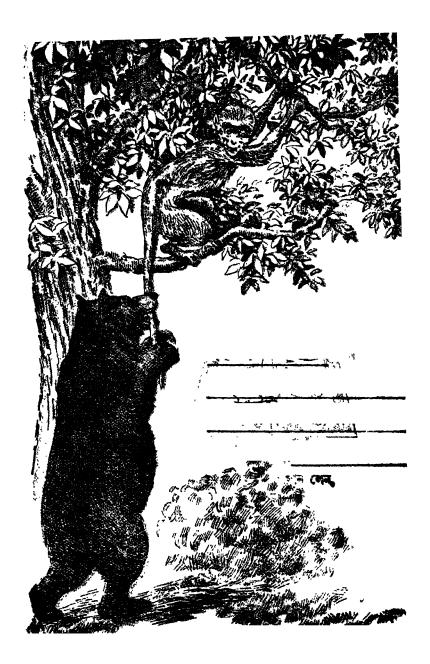
পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা)

ভূমিকা

এই বইটির রচনাকাল ইংরাজী ১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা ক'রে সমস্ত পৃথিবী যখন শঙ্কিত ও ভয়ার্ত্ত হয়ে প্রতিদিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে খবরের কাগজ পাঠ করতো।

আজ সেদিন কেটে গিয়েছে। পৃথিবীর সে গঠনও এখন গেছে বদলে। তবুও এই গল্পটি যাদের জন্যে লেখা, যদি তাদের মনে সমভাবে আবেদন জাগায় তাহ'লে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো। পরিশেষে ব'লে রাখা ভালো যে, কোন একটি বিদেশী গল্প থেকে আমি এই গল্পটি রচনা করার প্রেরণা লাভ করি।

২৬শে অগাষ্ট
১৯৫০

ইতি
গ্রন্থকার

……যারা পৃথিবীকে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের জব্দ করতে কতক্ষণ ?

মঙ্গলগ্র:হর বৈজ্ঞানিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডক্টর ঘোষ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বে
জায়গায় তিনি বেশীদিন চাকরি করতে পারেন না। বে
পারেন না, তার কোন সঠিক কারণও জানা যায় ন
তবে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এখানে স্বাস্থ্য টিকছে ন
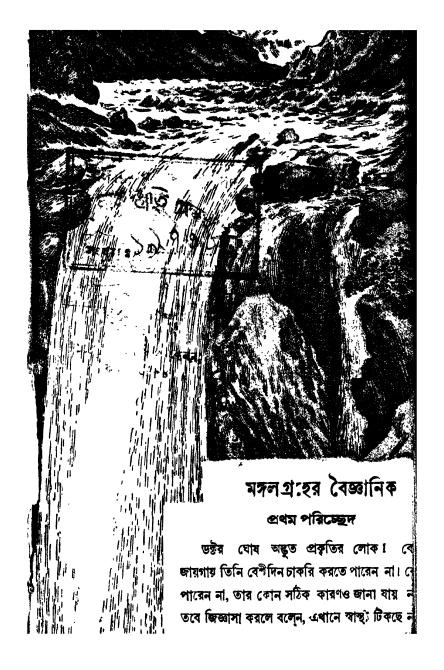
কথাটার মধ্যে হয়ত কোন সত্য থাকতে পারে। তা না হ'লে হাজার টাকা মাইনের চাকরি কি কেউ এত সহজে ছাড়তে পারে। সবাই এই কথা ভাবে।

ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছে, কিন্তু কোথাও তিনি বেশী দিন থাকতে পারেন নি। এক-বছর, কি বড়-জোর দু'বছর, তারপরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

এইভাবে পাঞ্জাব, এলাহাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে-ঘুরে তিনি যখন কলকাতার সায়েন্স-কলেজে এসে চাকরি নিলেন, তখন সবাই মনে করলে, বোধহয় এইবার আর কোন ভয় নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। বাঙালী কি বাংলাদেশ ছেড়ে কখনো বেশীদিন বাইরে থাকতে পারে।

কিন্তু এখানেও যখন তারি পুনরাবৃত্তি হলো তখন সকলের আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ইউনিভারসিটির প্রফেসার-মহল তাঁকে ঘিরে ধ'রে বললেন, আপনার মত গুণীব্যক্তিকে আমরা কিছুতেই ছাড়বো না। বাংলাদেশের ছেলেরা কোথায় যাবে, আপনি যদি তাদের শিক্ষার ভার না নেন। বিশেষ ক'রে এই বিজ্ঞানের যুগে, আপনার কাছ থেকে দেশের লোক যে অনেক-কিছু আশা করে। আজ আপনি যদি এইভাবে সরে দাঁড়ান, তাহ'লে বাংলাদেশ অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে বৈজ্ঞানিক-জগতে।

অসম্ভব যে শক্তিসম্পন্ন হয়। এই ব'লে
তিনি আবার চুপ করলেন।

ডক্টর ঘোষের সেই বিরাট গবেষণাগার দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন, কেন তিনি চাকরি করতে চাননা, দিনরাত শুধু পড়াশুনা করেন আর এর মধ্যে ডুবে থাকেন।

তবু তাঁরা বললেন, অন্তত আপনি এইসব বিজ্ঞানের অতি-আধুনিক আবিষ্কার সম্বন্ধে যদি ছাত্রদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন তাহ'লে এ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

ডক্টর ঘোষ বললেন, এই মনে করেই আমি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আমার মনে হয়, বৈজ্ঞানিক-জগতে দ্রুত যে-সব পরিবর্ত্তন ঘটছে, সেগুলি আগে শিক্ষা করি, তারপরে ছাত্রদের শেখাবো। এই কারণে আমার পক্ষে অধ্যাপনা করা এখন অসম্ভব। আরো কিছুদিন আমায় আপনারা একটু নির্জ্জনে থাকতে দিন।

ব'লে ডক্টর ঘোষ তাঁদের সকলের কাছে হাত জোড় করলেন। এত-বড় পণ্ডিত-লোকের এখনো লেখাপড়ায় এত অনুরাগ দেখে তাঁদের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না। তাঁরা সকলে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে চলে এলেন।

ডক্টর ঘোষের অবস্থা ভালো। পিতা কলকাতার সাহেব-পাড়ায় খান-চারেক বাড়ী রেখে গেছেন, তারি আয়ে অতি স্বচ্ছন্দে দিন

চলে যায়। সংসারের লোকের মধ্যে তাঁরা শুধু স্বামী-স্ত্রী আর কয়েকজন ঝি চাকর। থিয়েটার রোডের একটা নির্জ্জন বাড়ীতে তাঁরা বাস করেন।

এ-ছাড়া ডক্টর ঘোষের ছোট একটি মোটরগাড়ী আছে। তাতে ক'রে তিনি সপ্তাহে চারদিন গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যান। ফিরতে এক-একদিন রাত্তির বারোটা বেজে যায়। তিনি নিজেই মোটর ড্রাইভ করেন।

একদিন রাত্তির বারোটার সময় তিনি একাকী বেড়িয়ে ফিরছিলেন। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে থিয়েটার রোড দিয়ে আসছিলেন। এই রাস্তাটায় রাত্রে গাড়ী চালাতে তাঁর খুব ভালো লাগে। যেমন নির্জ্জন, তেমনি আলো আর গোলমাল কম। ফুটপাতের দু'ধারে কত ঝাঁকড়া গাছ, বাড়ীর সামনে ছোট-ছোট কত বাগান, তা থেকে ফুলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসে—বেশ একটা পল্লীর সুর লাগে তাঁর প্রাণে। সহরের বুকের মধ্যে থেকেও এ-রকম গ্রাম্য-নীরবতা আর কোথাও পাওয়া যায়না।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতেই একটা হৈ-চৈ রব তাঁর কানে এলো এবং শাঁ ক'রে একটা মোটরগাড়ী তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল।

'ধর ধর' ক'রে কতকগুলো লোক খানিকটা ছুটে এলো বটে, কিন্তু গাড়ীটা ততক্ষণ অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে—কোন ফল হলো না।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ডক্টর ঘোষ গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? একজন হিন্দীতে বললে, একটি লোককে চাপা দিয়ে গাড়ীটা ভেগেছে।

এত রাত্তিরে এ-পাড়ায় সাহেব-সুবোদের চাপ্‌রাসী-বাবুর্চ্চিরাই দু'চার জন পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তিনি জানতেন।

তবুও কৌতূহলবশত তিনি প্রশ্ন করলেন, কাকে চাপা দিয়েছে ?

একটা মর্দ্দানাকে। বলতে-বলতে তারা আবার ছুটে ঘটনাস্থলে চলে গেল।

ডক্টর ঘোষ খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখলেন, একটা লোক অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে আছে, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি চাপরাসী শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। একে জায়গাটায় অন্ধকার, তায় লোকটির শরীরের চারিদিকে এমন কেটেকুটে গিয়েছে যে, চেনাই শক্ত।

যাই হোক্, ডক্টর ঘোষ তাকে ধরাধরি ক'রে নিজের মোটরে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা মেডিক্যাল-কলেজে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন চাপরাসী গেল, একটা কাগজ দিয়ে তার মাথায় হাওয়া করতে-করতে।

এমারজেন্সি-ওয়ার্ডে তাড়াতাড়ি তাকে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে তারপর ডক্টর ঘোষ পাশের ঘরে গেলেন—রুগীকে কোথায়,

কিভাবে পেয়েছেন, সাক্ষীসমেত তার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করাতে।

এইসব করাতে-করাতে আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

হাসপাতালের ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা বাজলো।

তিনি আর দেরী করলেন না। ঘড়ির দিকে চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন।

গাড়ীবারান্দার মধ্যে তাঁর মোটরটা দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলে তিনি আগে সেই চাপরাসীকে উঠতে বললেন, তারপর যেমন নিজে উঠতে যাচ্ছেন, অমনি ছুটতে-ছুটতে একজন ডাক্তার ওপর থেকে এসে বললেন, রুগী একবার এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ডক্টর ঘোষ বিস্মিতকণ্ঠে করলেন, আমার সঙ্গে? ব্যাপার কি বলুন ত'?

ডাক্তারটি তখন যা বললেন তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে, মিনিট-দশেক হলো তাঁর জ্ঞান হয়েছে, আর জ্ঞান হবার পর থেকে কেবলই রুগী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। এদিকে রুগীর হার্টের অবস্থা যে-রকম দুর্ব্বল তাতে যে-কোন সময় মারা যেতে পারেন। কাজেই তাঁর শেষ অনুরোধটা রক্ষা করবার জন্য তিনি তাঁকে ডাকতে এসেছেন।

ডক্টর ঘোষ বললেন, কিন্তু আমি ত' তাঁকে চিনি না!

ডাক্তারবাবু বললেন, না চিনলেও এ-সময় তিনি হয়ত কোন দরকারী কথা আপনাকে বলতে চান।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানি

আচ্ছা চলুন, ব'লে সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রুগীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ডাক্তার ও নার্স সবাই সেখান থেকে সরে গেল। শুধু সেই রুগীর শয্যাপার্শ্বে ডক্টর ঘোষ গিয়ে দাঁড়ালেন।

নির্জ্জন ঘর। মাথার ওপর থেকে মৃদু একটু ইলেক্‌ট্রিক আলো এসে পড়েছে বহু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও চাদর-ঢাকা সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিরটির মুখে।

ডক্টর ঘোষকে দেখে হঠাৎ তাঁর স্তিমিত চোখ দু'টি যেন জ্বলে উঠলো। তিনি তখন তাঁকে ইসারা ক'রে আরো কাছে আসতে বললেন।

ডক্টর ঘোষ তাঁর মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন, কিন্তু আর-একটি অনুরোধ আমি আপনাকে করবো, আগে বলুন, আপনি তা রক্ষা করবেন ?

ডক্টর ঘোষকে একটু ইতস্তত করতে দেখে তিনি আবার বললেন, বলুন ?···আপনি তা পারবেন···আপনার মুখে-চোখে আমি সে দৃঢ়তা দেখতে পাচ্ছি।

ডক্টর ঘোষকে তখনো চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি বললেন, আপনি কি কোন বিপদের আশঙ্কা করছেন ?

ডক্টর ঘোষ বললেন, না, কোন বিপদকেই আমি ভয় করিনা।

তাহ'লে আমি আপনাকে বিশ্বাস ক'রে বলি, আপনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এই ব'লে তিনি শুরু করলেন : আমার নাম শম্ভুনাথ রাহা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

নাম শুনেই ডক্টর ঘোষ চম্‌কে উঠলেন এবং দু'হাত তুলে নমস্কার করতে-করতে বললেন, আপনি অধ্যাপক রাহা, যিনি পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করছেন ?

অধ্যাপক রাহা বললেন, তাহ'লে দেখছি আপনি আমার নাম শুনেছেন! ভালই হ'লো এখন, তবে বলি শুনুন—আমার এই অবস্থা…দুর্ঘটনার ফলে মনে করবেন না, তারা আমাকে মেরে ফেলবার জন্য মোটরের তলায় ফেলে দিয়েছিল! সেই নির্বোধগুলো আমার কাছ থেকে এই গোপনীয় তথ্যটা জানতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের দিইনি। অবশ্য 'বোরোরা' এর প্রতিশোধ নেবে, সে জানে আমাকে, কিন্তু উপস্থিত আমার স্ত্রীর ভারী বিপদ ১৫৭ নং স্যানি পার্কে সে থাকে। তাকে এখনি সেই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে হবে, সে যেন নিরাপদে থাকে—আমায় কথা দিন, বলুন, আমার এই শেষ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন ?

এই ব'লে তিনি কাতরচোখে ডক্টর ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডক্টর ঘোষ একটু ভেবে বললেন, নিশ্চয়ই করবো।

তিনি বললেন, তাহ'লে আর একমুহূর্ত্ত-ও দেরী করবেন না। এখনি সেখানে চলে যান, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

ডক্টর ঘোষ পুনরায় তাঁকে নমস্কার ক'রে অধ্যাপকের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে তিনি যখন সেই বাড়ীটা বার করলেন তখন প্রায় রাত্তির পৌনে-ছ'টো। নিস্তব্ধ সব বাড়ী। অন্ধকার। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই।

ডক্টর ঘোষ মোটরটা দরজার সামনে রেখে 'কলিং বেলটা' টিপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একজন চাপরাসী বেরিয়ে এসে তাঁকে সেলাম করলে।

তিনি বললেন, মেমসাহেবকো সেলাম দেনা। এই ব'লে একটুক্‌রো কাগজে নিজের নামটা লিখে তার হাতে দিলেন।

চাপরাসী তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এসে তাঁকে অধ্যাপক রাহার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল।

ডক্টর ঘোষ তখন তাঁকে যা-যা হয়েছিল সমস্ত খুলে বললেন।

স্বামীর এই বিপদের কথা শুনে তিনি ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে ব'সে পড়লেন—তাঁর ছ'চোখ দিয়ে অজস্রধারায় জল পড়তে লাগল।

ডক্টর ঘোষ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, এখন কাঁদবার সময় নয় দিদি—তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, তা নাহ'লে এখনি হয়ত আপনিও বিপদে পড়তে পারেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

আমার বিপদ হয় হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই—তাঁর কেন এমন হলো! এই ব'লে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ছি-ছি, এখন থেকে কেঁদে তাঁর অকল্যাণ করবেন না! চলুন আমরা এখুনি হাসপাতালে যাই।

একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপক রাহার স্ত্রী ডক্টর ঘোষের মোটরে এসে বসলেন।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছতেই নার্স ও ডাক্তার এসে তাঁদের বললে, এখন আর দেখা হবেনা, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তখন অধ্যাপক-পত্নী কাঁদতে-কাঁদতে নার্সের একটা হাত চেপে ধ'রে বললেন, একবার আমার স্বামীকে দেখতে দাও ভাই—আমি দূর থেকে শুধু চুপিচুপি দেখে চলে যাবো।

নার্স বললে, সে হয়না, এত রাত্রে যদি তাঁর ঘুম ভেঙে যায় ত' আমরা মুস্কিলে পড়বো। অনেক কষ্টে তবে তাঁকে ঘুম পাড়িয়েছি। কাল সকালে আসবেন।

অগত্যা তাঁদের ফিরে-যেতে হলো।

ডক্টর ঘোষ তখন তাঁর নিজের বাড়ীতে অধ্যাপক রাহার স্ত্রীকে ও চাকরকে নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ডক্টর ঘোষ তাঁর স্ত্রী ও অধ্যাপক রাহার স্ত্রীকে নিয়ে যথাসময়ে হাসপাতালে গেলেন।

অধ্যাপক রাহা তাঁদের সকলকে সাদর আহ্বান জানালেন।

কিন্তু নার্স তাঁদের চুপিচুপি বললেন, ডাক্তার একেবারে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন তাঁকে কথা কইতে।

ডক্টর ঘোষ তখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। শুধু অধ্যাপক-পত্নী রইলেন ঘরের মধ্যে।

নার্স ও তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে এসে বললেন, রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। যদিও এখন বেশ সুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আরও তিনটে দিন না কাটলে কিছু বলা যায়না।

আশ্চর্য্য! তিনদিন পরে সত্যি-সত্যি অধ্যাপক রাহার মৃত্যু হলো।

কিন্তু ডাক্তারেরা সার্টিফিকেট দিলেন এই ব'লে যে, দেহের মধ্যে দারুণ রক্ত ক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে। যদিও মোটর-দুর্ঘটনা এর প্রত্যক্ষ কারণ, তবুও মনে হয় এটা স্বেচ্ছাকৃত। এর পেছনে একটা দারুণ ষড়যন্ত্র রয়েছে।

অধ্যাপক রাহা ইতিমধ্যে হাসপাতালে একটা উইল ক'রে ফেলেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, ডক্টর ঘোষকে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীটা দান করলেন শুধু একটিমাত্র সর্ত্তে যে, যতদিন তাঁর স্ত্রী জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর ভরণ-পোষণ তাঁকে বহন করতে হবে। অধ্যাপক রাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বলতে যা-কিছু বোঝায়, সবই ছিল সেই ল্যাবরেটরীটি। কারণ,

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

যা-কিছু তিনি এতদিন রোজগার করেছেন, সব দিয়ে শুধু যন্ত্রপাতি ও বই কিনেছিলেন।

এইভাবে অকস্মাৎ অধ্যাপকের স্ত্রীর ভার ডক্টর ঘোষের ওপর এসে পড়লো।

বড় বোনের মত ডক্টর ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে সর্ব্বদা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

এদিকে হলো কি, অধ্যাপকের মৃত্যুর পরের দিনই তাঁর উকিল এসে ডক্টর ঘোষকে বললেন, ল্যাবরেটরীর সমস্ত চার্জ্জ বুঝে নিতে।

তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে উকিলবাবুকে নিয়ে মোটরে ক'রে স্যানি পার্কে অধ্যাপকের বাড়ীতে গেলেন।

অধ্যাপকের পুরনো চাকরটাও ডক্টর ঘোষের সঙ্গে গেল। সে গিয়ে বাড়ীর চাবী খুললে।

অনেকখানি জমির ওপর গাছপালা-ঘেরা অতি নির্জ্জন এই বাড়ীটি।

সেদিন রাত্রে ডক্টর ঘোষ বুঝতেই পারেননি যে, এতখানি বাগান আছে সেই বাড়ীটার মধ্যে। বাগানের একেবারে দক্ষিণ কোণে বড়-বড় ঝাউগাছ-ঘেরা একটা স্বতন্ত্র বাড়ী। তার ছাদের ওপর বড়-বড় 'এরিয়াল' তার টাঙানো।

ওইটাই যে অধ্যাপক রাহার ল্যাবরেটরী তা আর বুঝতে তাঁদের বাকী রইলো না।

চাকর গিয়ে আগে ল্যাবরেটরীর বসবার ঘরটা খুললে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তার পিছনে-পিছনে উকিলবাবু ও ডক্টর ঘোষ সেখানে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু সেখান থেকে ল্যাবরেটরী-ঘরের মধ্যে ঢুকে অধ্যাপক রাহার বসবার চেয়ারের দিকে চেয়েই ডক্টর ঘোষ চমকে উঠলেন। দেখলেন, একজন লোক পিছন ফিরে সেখানে ব'সে আছে, আর তার চারিপাশে ছোট-বড় নানা রকমের আলো, নানা রকমের কুণ্ডলীকৃত তার, অদ্ভুত-অদ্ভুত কত কি যন্ত্রপাতি।

তাদের কথাবার্ত্তা শুনেও সেই লোকটি কিন্তু একবারও তাঁদের দিকে চাইল না।

তখন উকিলবাবু কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? এখানে কি করছো উত্তর দাও শীগ্‌গির।

সব চুপচাপ।...কোন উত্তর এলোনা, সেখান থেকে। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর সেই বিরাট ঘরের মধ্যে খাঁ-খাঁ করতে লাগল।

ডক্টর ঘোষ আস্তে-আস্তে এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটার কাঁধে যেমন হাত রাখলেন, অমনি ধপাস্ ক'রে ঘরের মেঝেয় সে প'ড়ে গেল।

তাঁরা তখন দেখলেন, লোকটা মৃত, তার সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মত কঠিন। বিস্ময়ে তখন সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

চকিতে ডক্টর ঘোষের মনে পড়লো অধ্যাপকের সেই কথাগুলো...তারা আমায় মেরে ফেলবার জন্যে গাড়ার তলায় ফেলে দিয়েছে...তারা আমার এই গোপন-তথ্যটি জানবার জন্য

ষড়যন্ত্র করেছে···তারা নির্ব্বোধ!···বোরোরা এর প্রতিশোধ নেবে···সে সমস্তই জানতে পারবে।

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সমস্ত দেহ যেন শিউরে উঠলো। সেই মৃত লোকটি যে হত্যাকারীদের একজন এবং অধ্যাপকের সেই গোপন-তথ্যটি জানতে পেরেছিল, সে-সম্বন্ধে ডক্টর ঘোষ নিশ্চিত হলেন। হায়! সেই হতভাগ্য যদি সমস্ত জানতে না চেষ্টা করতো তাহ'লে হয়ত অকালে প্রাণ হারাতো না!

এই কথা ভাবতে-ভাবতে তৎক্ষণাৎ ডক্টর ঘোষ থানায় টেলিফোন ক'রে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ এসে গেল। তারা ঘরের মধ্যে চারিদিক তন্ন-তন্ন ক'রে দেখে খাতায় সব লিখে নিলে। তারপর সেখানকার অনেকগুলি ফটো তুলে নিয়ে এবং সেই মৃত দেহটাকে নিয়ে চলে গেল।

পুলিশ আসবার আগেই ডক্টর ঘোষ সেই টেবিলের ওপর যে-সব খাতাপত্তর ছিল, সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, বৈজ্ঞানিকদের, বিশেষ ক'রে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের এই খাতাপত্তরগুলির কি মূল্য! কিন্তু হায়! তাঁর সে আশা ব্যর্থ হলো! পুলিশ চলে যাবার পর তিনি তা প'ড়ে হতাশ হলেন। দেখলেন, অধ্যাপক রাহা আসল কথা কিছুই তাতে লিখে রাখেন নি। তবে, তাঁর এই গবেষণা সফল হ'লে একদিন এই পৃথিবীতে অসম্ভব সম্ভব হবে তার সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করেছেন। তাঁর সেই-

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানি

সব ছেলেমানুষী পরিকল্পনার কথা প'ড়ে ডক্টর ঘোষ তখন মনে-মনে হেসেছিলেন। অবশ্য, পরে তিনি আর হাসেন নি। কারণ, অধ্যাপক রাহা যা-যা ব'লে গিয়েছিলেন, একদিন তার প্রমাণ তিনি হাতে-হাতে পেয়েছিলেন। কেমন ক'রে এইবার তাই বলছি।

সেইদিন ল্যাবরেটরী থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ চিঠির বাক্সটা দেখে ডক্টর ঘোষের কি মনে হলো। তিনি চাবি দিয়ে সেই বাক্সটি খুললেন। অনেকগুলো চিঠি এসে তাঁর মধ্যে জমেছিল, কিন্তু একখানি চিঠি তাঁর নিজের নামে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তাঁকে কে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিলে, তিনি ত' ভেবেই পেলেন না। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে নীচে সই দেখে তিনি আরো অবাক হয়ে গেলেন! অধ্যাপক রাহা তাঁকে লিখেছেন! মৃত্যুর আগের দিনের তারিখ দেওয়া তাতে। তিনি চিঠিখানি হাতে ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং বাড়ীতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম গভীর মনোযোগসহকারে সেখানি পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল—প্রিয় ডক্টর ঘোষ, ভগবানের ইচ্ছা না থাকলে আমার একান্ত প্রয়োজনের সময় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার দেখা পেতুম না। আমি জানি, আপনি ছাড়া আর কেউ আমার এইঅসম্পূর্ণ কাজ করতে পারবেন না। তাই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ওপর মঙ্গলগ্রহের গবেষণার ভার ছেড়ে দিয়ে আজ আমি পরপারে যাত্রা করছি! আমার ল্যাবরেটরী সংক্রান্ত

যাবতীয় বিষয় আমি আপনার নামে উইল ক'রে দিয়েছি। যথাসময়ে আমার উকিল আপনাকে তার সমস্ত ভার বুঝিয়ে দেবে। তবে আপনার ঘাড়ে যে আজ গুরু-দায়িত্ব চাপিয়ে যাচ্ছি, তার সম্বন্ধে গোড়া থেকে আপনাকে কিছু সতর্ক ক'রে দেবার জন্য বিশেষ ক'রে এই চিঠি লিখছি। মনে রাখবেন, যে বিরাট শক্তিকে আজ আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, তা একদিন আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এই পৃথিবীর ভবিষ্যতকে এনে দেবে। আপনি নিজেই একদিন সম্পূর্ণরূপে তা উপলব্ধি করতে পারবেন—আমি যে 'নোট' লিখে রেখেছি সেগুলো পড়লে।

আমার স্ত্রীর লোহার সিন্দুকের মধ্যে সেই খাতা লুকোনো আছে, তাঁর কাছ থেকে সেটা চেয়ে নেবেন।

এইবার আমি যে-কথাটা বলছি, বিশেষ ক'রে তা মনে রাখবেন। আগে যে 'বোরোরা' নামের উল্লেখ করেছিলুম তা বোধহয় আপনার স্মরণ আছে। নামটি একটু অদ্ভুত রকমের নয়? কিন্তু এই নামটা কার, জানেন? ইনিই আমার বিশেষ বন্ধু মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক। খুব সাবধান! যদি জীবনের মায়া থাকে ত' তার সঙ্গে কথা বলবার আগে, আমার যন্ত্রপাতিগুলি যেমন সাজানো আছে, তার সামনে ব'সে মনে-মনে একবার ইংরিজীতে এই মন্ত্রটা আউড়ে নেবেন—'Horodons grow on the Shores of the Balgian Sea.' ব্যস্, আর দেখতে হবেনা। সঙ্গে-সঙ্গে আপনি একেবারে

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ডক্টর ঘোষের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি দেখা দিয়েই আবার সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, আমি কি জানি যে শেখাবো! আমার নিজের শিক্ষাই যে এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

তাঁরা মনে করলেন, ডক্টর ঘোষ বিনয় প্রকাশ করছেন। কেননা, সাত বছর বিলেতে থেকে বিজ্ঞানের গবেষণা ক'রে তিনি লণ্ডন ও বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর মুখ থেকে এইকথা শুনে তাঁরা বললেন, আপনি যদি এ-কথা বলেন ত' আমরা যাবো কোথায়?

ডক্টর ঘোষ এবার উত্তেজিতকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, জানেন, পৃথিবী প্রতিদিন বিজ্ঞানে কি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে?

বলতে-বলতে তিনি চট্ ক'রে তাঁর ঘরের টেবিলের একটা দেরাজ খুলে একখানা বিলিতি মাসিকপত্র তাঁদের সামনে ফেলে দিলেন। তারপর একটা পাতা খুলে বললেন, দেখুন, ইলেকট্রণ আজ কি অসম্ভব কাজ করছে! এই বস্তুটি আজ বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে এমন একটা জগত খুলে ধরেছে যে, তাঁরা মনে করছেন, অসম্ভব ব'লে আর কিছুই থাকবে না পৃথিবীতে। তাঁদের ধারণা, এই ইলেকট্রণের সাহায্যে একদিন অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে, রোগী রোগমুক্ত হবে, সোনাকে প্ল্যাটিনামে পরিণত করা যাবে, লোকের জামার পকেটে-পকেটে

ফিরবে রেডিও, রন্ধনকার্য্যে আর আগুনের প্রয়োজন হবেনা। এছাড়া, ঘরে ব'সে পৃথিবীর যে-কোন জায়গার মানুষকে দেখতে পাবেন, তাদের কথা শুনতে পাবেন—এক-কথায় সমস্ত পৃথিবীটা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে ধরা দেবে, ইলেকট্রণ—শুধু এই ইলেকট্রণের জন্যে।

এই ব'লে তিনি উত্তেজিতভাবে টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে চুপ করলেন।

প্রফেসাররা সবাই বিস্মিত-দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একজন শুধু বললেন, বলেন কি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। এই যে আজ 'টেলিভিসন যন্ত্র' নিয়ে পৃথিবীতে এত হৈ-চৈ প'ড়ে গেছে, জানেন, এর অনেকখানি সম্ভব হয়েছে শুধু এই ইলেকট্রণের জন্যে? কথা বলতে-বলতে তিনি তাঁদের নিয়ে পাশের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

এটা তাঁর ল্যাবরেটরী। নানা রকমের যন্ত্রপাতি টেবিলের ওপর সাজানো। একটা যন্ত্রের কাছে গিয়ে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে সেটাকে ছুঁয়ে বললেন, এইটার নাম ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর মধ্যে দিয়ে এই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ, ইলেকট্রণকে দেখা যায়।

এই ইলেকট্রণ হলো, বিদ্যুতকণা। এ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাদের দেখাই যায়না। অণু-পরমাণুর শতাংশের একাংশের চেয়েও হাজারগুণ ছোট। আর এই অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি যখন একত্রিত হয় তখন কি

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞ

মঙ্গলগ্রহে চলে যাবেন। এখন হয়ত আমার এই কথাটা শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে, মনে করছেন কি ছেলে-মানুষী-কাণ্ড। কিন্তু তা নয়। পরে বুঝতে পারবেন আমি কেন আপনাকে এত সতর্ক ক'রে দিয়েছি। যাই হোক্, বোরোরাকে বলবেন আমার যা যা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে একখানা চিঠি দিলুম সেটা তাকে পড়িয়ে শোনাবেন। সে ইংরিজী জানে।

এছাড়া, আরো একটা কথা বলবার আছে। আমার খাতা থেকে এবং বোরোরার কাছ থেকে আপনি মঙ্গলগ্রহের সভ্যতার সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানতে পারবেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের কাছে সে-সব কিছু ব্যক্ত করবেন না। বিজ্ঞানের বলে তারা যে কোথায় উঠে গেছে তা এদের ধারণা নেই। এরা তাদের সেই অতিউন্নত সভ্যতাকে মেনে নিতে চাইবে না। কিন্তু এখানকার লোকেরা কেবল চাইবে তাদের সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের ধ্বংস সাধন করতে। কাজেই আবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি, সেখানকার কোন খবর আপনি বোরোরার অনুমতি ছাড়া কোথাও প্রকাশ করবেন না। স্মরণ রাখবেন যে, তার কথাই চুড়ান্ত, সে-সময় আপনার যাই কেন-না মনে হোক কর্তব্য ব'লে। তবে একটা সান্ত্বনা এই যে, যদি আপনার দেশ কখনো বিপদগ্রস্ত হয় ত' মঙ্গলগ্রহের লোকেরা এসে তাকে রক্ষা করবে, তাদের সে ক্ষমতা আছে ভুলে যাবেন না।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন নির্ব্বিঘ্নে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হন। হাজার-হাজার বিপদ সর্ব্বদা আপনাকে ঘিরে থাকবে এবং এমন লোকেরও অভাব হবে না, যারা মরিয়া হ'য়ে আপনাকে খুন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না। অবশ্য যদি তাদের মনে হয় যে, আপনাকে হত্যা করলে তারা মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে সব তথ্য জানতে পারবে।

কাজেই খুব সাবধান, কোন প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে যেন যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবেন না। সর্ব্বদা নিজের মস্তিষ্কে সমস্ত জিনিষগুলো রাখতে চেষ্টা করবেন, আমিও ঠিক তাই করতুম। দেখবেন যখন আপনার নেহাত দরকার পড়বে তখন সমস্ত মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞান কেবল আপনারই কাজে লাগবে।

নমস্কার। চিরবিদায় বন্ধু।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ

চিঠিখানি পড়া শেষ ক'রে ডক্টর ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোককে এতখানি বিশ্বাস যিনি করতে পারেন, তাঁর কথা মনে ক'রে তিনি শ্রদ্ধায় একবার মাথা নত করলেন। তারপর মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তিনি যেন এই বিশ্বাসের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করতে পারেন।

অধ্যাপক রাহার সম্বন্ধে অনেক-কিছুই ডক্টর ঘোষ জানতেন। এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও তিনি যে কত-বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, আমাদের দেশের লোকের কাছে সে পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও, তাঁর কাছে কিছুমাত্র ছিল না। বিলাতের বড়-বড় কাগজে তাঁহার বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার জন্য সমস্ত সভ্য-জগত তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব'লে সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন, আকাশ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। তাই গ্রহনক্ষত্রের সম্বন্ধে বিশেষ কোন-কিছু জানতে হ'লে বিলাতের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর পরামর্শ আগে নিতেন। চিঠিপত্রে অনবরত তাঁদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলতো। বিলাতে বহুদিন তিনি ছিলেন এবং বহু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সেখানে বহুদিন একত্রে গবেষণা করেছিলেন মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তাঁর মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সেখানে এমন কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন প্রাণী আছে, যারা অনবরত আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। সেইজন্যে বারবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন এই মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে. কিন্তু বারবার অকৃতকার্য্য হওয়ায় অবশেষে তিনি সে চিন্তা ত্যাগ করেছিলেন। শেষে হঠাৎ একদিন মঙ্গলগ্রহ থেকে তাঁর কাছে এলো আহ্বান। সে বড় মজার ব্যাপার···সম্পূর্ণ একটা দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে।

একদিন রাত্রে অধ্যাপক রাহা বসেছিলেন তাঁর বিজ্ঞানাগারে। সেইদিন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে ছিল এই মঙ্গলগ্রহ। তাঁর সামনে পড়বার ইলেকট্রিক টেবিল-আলোটা জ্বলছিল। এই আলোর পিছনে খুব বড় এবং চকচকে একটা প্রতি-ফলনাধার ছিল। আলোর দিকে এমনভাবে তিনি পিছন ফিরে বসেছিলেন যে, তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে আলো এসে—যে বইটা তিনি পড়ছিলেন তার ওপর পড়েছিল।

পড়তে-পড়তে হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে, মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করছে, অবিশ্রাম কতকগুলো তরঙ্গের মত কি যেন ঠেলে-ঠেলে উঠছে সেখানে। তাঁর দেহের মধ্যে কোথায় কি যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু হচ্ছে, এইটা অনুভব ক'রে তিনি অত্যন্ত সচকিত হয়ে উঠলেন। তা'ছাড়া এইসমস্ত ব্যাপারের ভেতরে তিনি যে জিনিষটা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হলেন, সেটা

হচ্ছে নিয়মানুবর্ত্তীতা, অর্থাৎ সেই শিহরণটা আসছিল একটা ছন্দে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর। এই থেকে তাঁর মনে এই ধারণা উপস্থিত হলো যে, নিশ্চয়ই এটাব াইরের কোন শক্তির ব'লে সম্ভব হচ্ছে। তখনই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্ত্রীকে এনে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, তিনিও ঠিক সেই একই-রকম অনুভূতি লাভ করছেন কিনা। যিনি বৈজ্ঞানিক এবং যাঁর মন এতদিন বিজ্ঞানের সামান্য সূত্র ধ'রে এগিয়ে এসেছে, তাঁর কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। তাই পরদিন থেকে তিনি এই নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু ক'রে দিলেন। এবং শীঘ্রই অধ্যাপক রাহা বুঝতে পারলেন যে, এইসমস্ত গোলমালের মূল হ'লো, সেই প্রতিফলনাধার থেকে যে আলোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার কেন্দ্রস্থল।

এর কয়েকদিন পরে অধ্যাপক রাহা বোম্বে চলে গেলেন এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় ও নামজাদা দোকান থেকে বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে এলেন। অধ্যাপক রাহার ধারণা হ'লো এই যে, যেমন আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়, ঠিক তেমনিভাবে কতকগুলি তাড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সেই প্রতিফলনাধারের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়। আর তারই ফলে মানুষের মস্তিষ্কে কোনপ্রকারে একটা ছায়া এসে পড়ে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

সেইদিন-ই অপরাহ্ণে অধ্যাপক রাহা তাঁর এই পরিকল্পনাটির প্রমাণ পেলেন হাতে-হাতে। যেই তিনি সেই প্রতিফলনাধারের আলোকক্ষেত্রের মধ্যে মাথা দিয়ে বসলেন, অমনি তিনি আবার অনুভব করলেন, কতকগুলি তরঙ্গ যেন মাথার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে, তবে এবার এই বিশেষত্ব তাঁর চোখে পড়লো যে, প্রতিফলিত আলোক কেবলমাত্র মাথার পশ্চাদভাগে লাগলে তবে এইরকম হয়; মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেই সঙ্গে-সঙ্গে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! এই অদ্ভুত প্রক্রিয়াটির সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, মানুষের মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে এমন একটা 'সেল' আছে, যা 'রিসিভারের' মত কাজ করে—এই তরঙ্গগুলি তাতেই ধরা পড়ে।

কিছুক্ষণ এইভাবে ব'সে থাকবার পর তিনি দেখলেন, তাঁর মাথার মধ্যে সেই তরঙ্গগুলি ক্রমশ প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছে এবং হঠাৎ একসময় তাঁর চোখের সামনে থেকে সেই ঘরটা কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আর অদ্ভুত-রকমের একটা ছবি সেখানে এসে হাজির হ'লো। তিনি বিস্মিত হয়ে চাইতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে মঙ্গলগ্রহ! একটা ধোঁয়াটে-কুয়াশার আবরণ দিয়ে যেন তার চতুর্দ্দিক ঘেরা। মঙ্গলগ্রহের বিশেষ-বিশেষ লক্ষণগুলি সবই তাতে পরিস্ফুট। বলাবাহুল্য, এগুলি দেখে অধ্যাপক রাহার মত একজন বৈজ্ঞানিকের চিনতে বিলম্ব হ'লো না।

মঙ্গলগ্রহের বৈ

দেখতে-দেখতে সেই ছবিটা যেই সরে গেল, আবার তার জায়গায় এলো তাঁর নিজের গ্রহ, এই পৃথিবীর প্রতিকৃতি। তিনি এর বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, সাগর, পর্ব্বত দেখে চিনতে পারলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এটাও চোখের সামনে থেকে সরে গেল। তৃতীয় ছবি এলো মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবীর একসঙ্গে—যেন এক গ্রহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে অন্য গ্রহে গিয়ে পড়ছে।

এইগুলি দেখে তখন অধ্যাপক রাহা বুঝতে পারলেন যে, এই ছবিগুলি যে ব্যক্তি প্রেরণ করছেন, তিনি যেন বোঝাতে চাইছেন যে, মঙ্গলগ্রহ থেকে এগুলি আসছে।

অধ্যাপক রাহা বুঝতেই পারলেন না কেমন ক'রে এইগুলি প্রেরিত হচ্ছে। চিন্তা করতে-করতে তাঁর মাথা কেবল গুলিয়ে যায়। তবুও এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন দ্বিধা রইল না যে, এগুলি প্রেরিত হ'চ্ছে কারুর দ্বারা এবং যে বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে এই ছবিগুলি প্রেরিত হ'চ্ছে তার নাম দিলেন তিনি 'টেলিপ্যাথী'।

এই বিষয়টিতে স্থিরসিদ্ধান্ত হতে পেরে অধ্যাপক রাহা মনে-মনে রীতিমত খুশী হয়ে উঠলেন। তখন তিনি যুক্তির দ্বারা নিজের মনকে বোঝাতে লাগলেন, যদি তাঁর মস্তিষ্কে এমন কোন ক্ষমতাশালী কোষ থাকে যে, তার সাহায্যে 'রিসিভারের' কার্য্য সম্ভব হয়, তবে অপর কোন কোষ ত'

এরূপ থাকতে পারে, যার দ্বারা এই প্রেরণ-কার্য্যও সম্পন্ন হতে পারে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক যদি গ্রহণ করতে পারে, ত' প্রেরণ করতেই-বা পারবে না কেন?

এর প্রমাণ করবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তার মনকে কেন্দ্রীভূত করলেন তাঁর নিজের ঘরের চিন্তায়, কিন্তু অসাধারণ কিছুই হ'লো না। হঠাৎ একটা কল্পনা তাঁর মনে এলো। তিনি মাথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু এবারেও কিছু হ'লো না। তখন তিনি তাঁর মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগটি প্রতিফলিত আলোক-ক্ষেত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করলেন এবং আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার ঘরটা সাদা একপ্রকার কুয়াশার মধ্যে। তখন আর তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইল না। তিনি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর এই সংবাদ মঙ্গলগ্রহের কোন ব্যক্তির নিকট পৌঁচেছে এবং সেখান থেকে আবার তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছে।

তিনি যে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন, এ-সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত হবার জন্য তিনি তখন তাঁর মুখটি প্রতিফলনাধারটির দিকে ফেরালেন এবং তার নিজের চেহারা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

যেই তাঁর মস্তকের পশ্চাদভাগটি তিনি এইভাবে তার কাছে নিয়ে গেলেন, অমনি তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন শূন্যে ভাসমান অবস্থায়।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

এমনি ক'রে সেদিন তিনি তাঁর মতবাদ প্রমাণিত করলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মাথায় এমন দু'টি বা তার বেশী কোষ আছে, যার একটি থাকে মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে এবং 'রিসিভারের' কাজ করে; আর, অপরটি থাকে সম্মুখে এবং তার দ্বারা চিন্তা-প্রেরণের কাজ চলে।

তারপর অধ্যাপক রাহা গম্ভীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন, আরো খবরের আশায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সেই আশা পূর্ণ হ'লো। একে-একে মঙ্গলগ্রহ, পৃথিবী—আবার এই দু'টি গ্রহের একত্রে আলোক বিনিময়, তাঁর নিজের মুখমণ্ডল এবং সর্ব্বশেষে সেই মঙ্গলগ্রহের সংবাদ-প্রেরকের মূর্ত্তি—সব তাঁর চোখের সামনে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! দীর্ঘ দেহ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপ ক'রে ব'সে আছেন—তাঁর বিরাট মুখমণ্ডল, সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত কপাল, দীর্ঘপক্ষাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড দুটি চোখে তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, উন্নত ও বলিষ্ঠ নাসিকা, দাড়ি গোঁফে মুখখানা ভরা, মাথার পাকা চুল এলোমেলো ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। তাঁর মুখের রঙ বা দেহের কোন বর্ণ ছবিতে দেখা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন বহু পুরাকালের দীর্ঘাকৃতি কোন-এক মানুষের বিশিষ্ট পাথরে খোদিত মূর্ত্তি বায়োস্কোপের পর্দ্দায় ভেসে উঠলো।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তাঁর পেছনে অতি জটিল ও অদ্ভুত রকমের কি-সব যন্ত্রপাতি রয়েছে অধ্যাপক রাহা তা দেখেও চিনতেই পারলেন না। তিনি তখন দু'টি 'রিফ্লেক্টর'কে এমনভাবে রাখলেন, যাতে ক'রে অল্প শ্রমে খবর পাঠানো এবং গ্রহণ করার সুবিধা হয়। একই সঙ্গে দু'টি 'রিফ্লেক্টরে' কাজ করবার জন্য তিনি তাদের সমকোণে প্রতিষ্ঠিত করলেন—একটা থেকে মাত্র নব্বুই ডিগ্রী ঘাড় ঘোরালেই যাতে আর-একটার প্রক্রিয়া সুরু হয়।

প্রথমে অধ্যাপক রাহা ছবির সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁর মনে হ'লো, শব্দের সাহায্য নিলে কেমন হয়, অর্থাৎ যে-রীতিতে টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এর পরীক্ষা শুরু ক'রে দিলেন। এবং কয়েকটা পরীক্ষার পরই অধ্যাপক রাহার এই পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করলো। সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারটা ক্রমশই বেশ বোধগম্য হয়ে উঠলো উভয়ের মধ্যে। এইভাবে তিনি একদিন জানতে পারলেন যে, তাঁর এই মঙ্গলগ্রহের বন্ধুটির নাম—বোরোরা।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই বৈজ্ঞানিকটির স্মৃতিশক্তি! অধ্যাপক রাহা যত দেখেন ততই স্তম্ভিত হ'য়ে যান। এ-রকম প্রবল যে কারো স্মৃতিশক্তি হ'তে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনো তার উল্লেখ পাননি। মাত্র পনেরো মিনিটে এক-একটা ইংরেজী অক্ষর এই মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকটি

আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। এইভাবে দিন-সাতেকের মধ্যে তিনি ইংরিজী সব অক্ষর ও মোটামুটি কতকগুলি ইংরিজি কথা শিখে ফেললেন তাদের অর্থ-সহ। প্রথমে শব্দের সাহায্যে অধ্যাপক রাহা তাঁকে অক্ষরগুলো শেখালেন, তারপর অক্ষর-গুলো জুড়ে-জুড়ে ছোট কথা এবং তারপর এই কথাগুলির অর্থ ছবির সাহায্যে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। এ-ছাড়া আরো নানারকম বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বোরোরাকে তিনি ইংরিজী ভাষা শিখিয়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকটি এমন অদ্ভুতভাবে ইংরিজী শিখে ফেললেন যে, অধ্যাপক রাহা যদি কোন বই প'ড়ে শোনাতেন, তা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে আবার মুখস্থ বলতে পারতেন একটা ভুলও না ক'রে! তিনি একদিন হতভম্ব হয়ে সেই বৈজ্ঞানিককে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি ক'রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কথা মনে ক'রে রাখলেন?

তার উত্তরে সেই বৈজ্ঞানিক জবাব দিলেন যে, অধ্যাপক রাহা যা বলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সেটার রেকর্ড তুলে নেন 'ফটো ইলেকট্রিক' যন্ত্রের সাহায্যে। এমন কি, এই পৃথিবীর গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধে তিনি যা-যা বলেছিলেন, সব তিন ঘণ্টার মধ্যে বোরোরা রেকর্ড ক'রে সমগ্র মঙ্গলগ্রহের লোকেদের মধ্যে তা বিতরণ করেছেন। একথা শুনে ডক্টর রাহা যে খুবই বিস্মিত হলেন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর চেয়েও

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

সহস্রগুণ তাঁর বিস্ময় বাড়লো যখন নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটলো।

এরপর একদিন অধ্যাপক রাহা Wonder of Modern Science নামক বইটি তাঁকে পড়ে শোনালেন। বোরোরা তা শুনে বললেন, 'এগুলি ত' ঐতিহাসিক তথ্য, এর আর এখন প্রয়োজন কি?'

অধ্যাপক রাহা তার কথা শুনে একটু আশ্চর্য্যবোধ করলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এগুলি মোটেই ঐতিহাসিক-তথ্য নয়—একেবারে অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

সেকথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপ ঢেলে বললেন, পাঁচ হাজার বছর আগে তাঁদের মঙ্গলগ্রহে বাষ্প-বিষয়ক আবিষ্কার শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বৈদ্যুতিক-আবিষ্কারের চরম নিদর্শন, তাও বোধহয় প্রায় চার হাজার বছর ধ'রে তাদের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তারপর কতকগুলি খাতাপত্তর দেখে তিনি বললেন, এ-ছাড়া রেডিও সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য—তাও মঙ্গলগ্রহের লোক শেষ ক'রে ফেলেছে প্রায় সাড়ে-তিন হাজার বছর আগে। উপরন্তু বোরোরা—অপর গ্রহের জীব-জগত সম্বন্ধে অধ্যাপকের যে ধারণা, তা শুনে মনে-মনে পুলকিত হলেন। এবং তার উত্তরে তাঁকে বললেন, তিনি যেন না মনে করেন যে, কেবল তাঁরই গ্রহের মাটিতে, অর্থাৎ পৃথিবীতেই মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি হয়েছে—এই নিয়ম জগতের সর্ব্বত্র এক। জীবনের বিকাশ সকল

স্থানে এবং এসত্য তিনি যাকে মৃত্যু বলেন, তার ঠিক পরেই বুঝতে পারবেন। এই ব'লে তিনি মঙ্গল-গ্রহের যাবতীয় কথা তাঁকে বললেন। সেখানকার ভৌগলিক-সীমা, সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার জীবজগত, উদ্ভিদ, পাহাড় পর্ব্বত, নদীনালা মাঠ প্রভৃতি কেমন ক'রে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানকার লোকজন কেমন, সমস্তই একে-একে বর্ণনা করলেন। মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে এইসব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে ডক্টর ঘোষ রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, তবে কি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মঙ্গলগ্রহের সম্বন্ধে যে ধারণা তা সবই ভুল!

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন যত যেতে লাগল ততই ডক্টর ঘোষ মঙ্গলগ্রহ থেকে আশ্চর্য্যজনক সব তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। বোরোরাও ডক্টর ঘোষ মারফৎ পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক-কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডক্টর ঘোষ ইংরিজি ভাষাটা খুব ভালো ক'রে তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা, বোরোরাই ছিলেন এ-বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহী। তিনি যখন শুনলেন যে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং তার ভাষা এই ইংরিজি—জগতের সবচেয়ে বেশী জাত জানে এবং ব্যবহার করে, তখন তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ইংরিজি ভাষায় যেসব বিষয় নিয়ে বই লেখা হয়েছে সব রেকর্ড ক'রে নিতে লাগলেন।

অধ্যাপক রাহা প্রথম-প্রথম মঙ্গলগ্রহ থেকে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতেন জন-সাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাতে অল্পদিনের মধ্যে এক বিপদ দেখা দিল। বহু গুপ্তচর ছদ্মবেশে অধ্যাপকের ঘরে ঢুকে এইসব মূল্যবান কাগজ-পত্র দেখে যেতেন, কখনো-কখনো-বা চুরি করতেন। যখন তিনি একথা বুঝতে পারলেন তখন সাবধান হলেন নিজের কাগজপত্র সম্বন্ধে। বাইরে আর কোন-কিছু তিনি রাখতেন না। তিনি এক অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর এই গবেষণাগুলি

লুকিয়ে রাখবার জন্য। তিনি একটা মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতেন আর সেই কথাগুলি বৈদ্যুতিক উপায়ে লোহার তারে রেকর্ড হয়ে যেতো। পরে এইগুলিকে তিনি আর-এক যন্ত্রের সাহায্যে আবার পড়তেন।

এমনি ক'রে অধ্যাপক রাহা মঙ্গলগ্রহ থেকে বহু বৈজ্ঞানিক-তথ্য সংগ্রহ ক'রে সব রেকর্ড ক'রে একটা লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে, পৃথিবীর মানব-সমাজে মঙ্গলকর, এমন অনেক মূল্যবান গবেষণা তিনি এইভাবে সংগ্রহ করেছিলেন।

ডক্টর ঘোষ সেইগুলি বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ার সাহায্যে প'ড়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন, কিন্তু সেগুলিকে এত প্রয়োজনীয় বস্তু ব'লে তাঁর মনে হ'লো যে, তিনি সে-সব কথা গোপন রাখলেন, সর্ব্বসাধারণকে জানতে দিলেন না।

তখনো ডক্টর ঘোষ অধ্যাপক রাহার হত্যাকাণ্ডের কথা বিস্মৃত হননি। যদিও পুলিশরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল এবং আসল হত্যাকারীর কোন সন্ধান করতে পারেনি, তবুও কিন্তু তাঁর মনে হতো, হত্যাকারীর অনুসন্ধান করা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য। অথচ কেমন ক'রে যে তিনি করবেন তা ভাবতেও পারতেন না। অধ্যাপক রাহার ঘরের মধ্যে যে লোকটি মরে পড়েছিল তা যেমন রহস্যজনক তেমনি অদ্ভুত ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

শবব্যবচ্ছেদ করেও মৃত্যুর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি!

যাই হোক্, যে, বা যারা অধ্যাপক রাহাকে হত্যা করুক না কেন, তারা যে এই কাজে খুব তৎপর সে-সম্বন্ধে ডক্টর ঘোষের মনে কোন সন্দেহ রইল না। তাই সর্ব্বদা তিনি খুব হুঁসিয়ার থাকতেন, কি জানি আবার যদি তারা কেউ আসে!

সেইজন্য ডক্টর ঘোষ অধ্যাপক রাহার বাড়ীটি ছেড়ে না দিয়ে সেইখানেই তাঁর গবেষণা চালাতে লাগলেন। কিন্তু এমনভাবে বাড়ীর চারিদিকে ইলেক্‌ট্রিক তার জড়িয়ে রেখে দিলেন যে, অজ্ঞাতসারে সেখানে কেউ ঢুকলেই বিদ্যুতের স্পর্শে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

এর কয়েকদিন পরে ডক্টর ঘোষ তাঁর লেবরেটরীতে ব'সে কাজ করছেন, এমন সময় বেয়ারা একখানা কার্ড এনে তাঁর হাতে দিলে। নামটা প'ড়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। শেঠ-ধনীরাম আগরওয়ালা—বোম্বে। এ-শ্রেণীর কোন লোকের সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্ব্বে কোন পরিচয় ছিল না। তাই মিনিট-কয়েক চিন্তা ক'রে তিনি কাগজপত্তরগুলো দেরাজের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর বেয়ারাকে বললেন, আগন্তুককে ভিতরে ডেকে আনতে।

কয়েক-মিনিট পরেই একজন ক্ষীণকায় প্রৌঢ় মাড়োয়ারী এসে ঘরে ঢুকলেন এবং ডক্টর ঘোষকে নমস্কার ক'রে সামনের একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞা

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির বেশভূষা দেখে বোঝা গেল যে, তিনি একজন রীতিমত ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁকে বসতে বলবার আগেই বিনানুরোধে একটা চেয়ারে উপবেশন করাতে ডক্টর ঘোষের মনে হলো, লোকটা অত্যন্ত অশিক্ষিত। যাই হোক, তাঁর কি প্রয়োজন জানবার জন্যে ডক্টর ঘোষ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই ?

শেঠজী তাঁর মুখে একটা গর্ব্বের হাসি টেনে এনে বললেন, আমি পৃথিবীর কোন বৃহত্তম ব্যবসায়-সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি। আপনার কাছে এক ব্যবসায়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা জানি আপনি এখন এক অতি মূল্যবান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর তারি জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি। যাক, সে-সব কথা পরে হবে—তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজী আছেন কিনা ?

ডক্টর ঘোষ ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বললেন, আমার সম্পত্তির সম্বন্ধে এত সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন ? আচ্ছা যাক, এ-সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমি তার আগে আপনাকে বলছি, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী নই। ব্যস্, আর কিছু বলবার আছে আপনার ?

একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে শেঠজী বললেন, ধীরে বাবুজী,

ধীরে। এত তাড়াতাড়ি করবেন না। আগে আমি কি বলি শুনুন, তারপর মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখবেন। আপনার বয়স আমার চেয়েও কম—তাছাড়া ব্যবসায় আমার চুল পাকলো—কাজেই কথাটা না শুনে হঠাৎ মাথা গরম করবেন না।

লোকটার এই গায়ে-প'ড়ে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা দেখে ডক্টর ঘোষের মন বিরক্তিতে ভরে উঠলো। এবং তিনি এর উত্তরে কিছু বলবার আগেই শেঠজী আবার আরম্ভ করলেন, আমি ও আমার বন্ধুরা সকলেই বুঝতে পেরেছি যে, মঙ্গলগ্রহ-বাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে কি-রকম এগিয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক-জগতে তারা যে আজ কতদূর অগ্রণী তা পৃথিবীর লোক ধারণাও করতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক রাহার গবেষণা পড়েই আমরা এটা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে, এই মঙ্গলগ্রহ-বাসীদের অসাধ্যসাধন করবার শক্তি আছে। তাদের বিজ্ঞান, তাদের যন্ত্রপাতি, তাদের ধ্বংস করবার অস্ত্র-শস্ত্র, আজ এক বিরাট ও অবিশ্বাস্য শক্তি অর্জ্জন করেছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এর মধ্যে আপনি টাকা উপার্জ্জন করতে পারেন লক্ষ-লক্ষ কোটী-কোটী। তাই আমরা সেই প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

এই ব'লে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে শেঠজী ডক্টর ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আরো উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন, ভেবে দেখুন, একদিনে আপনি লক্ষপতি, কোটিপতি হয়ে যাবেন! অধ্যাপক রাহার ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল না, তাই তিনি তাঁর এই

মঙ্গলগ্রহের বৈ

মূল্যবান আবিষ্কার আমাদের মত বিরাট ও শক্তিশালী কোম্পানীর কাছে বিক্রি না ক'রে বোকার মত শুধু পাণ্ডিত্য দেখিয়ে গেলেন, কাগজে-কাগজে সেগুলি ছাপিয়ে দিয়ে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, কিন্তু কি ফল হ'লো তাতে? সকলে সেগুলো পড়লে এবং দেখলে, ব্যস্। আর, তার জন্যে তিনি পেলেন কি? অষ্টরম্ভা! আর তারি ফলে হ'লো কি না—অর্থের অনটন ত' দূর হলোই না, উল্টে ছুটোছুটি করতে গিয়ে একদিন গাড়ী চাপা প'ড়ে বেচারী প্রাণ হারালো। আহা, ভাবলে বড় কষ্ট হয়। অথচ, দেখুন ত' তাঁর স্ত্রীর কি কষ্ট! একেবারে তাঁকে কপর্দ্দকহীন ক'রে রেখে গেলেন! খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তাঁর এই নির্ব্বুদ্ধিতার কথা লিখেছিল, আপনি পড়েন নি? এই ব'লে শেঠজী দরদীকণ্ঠে আর-একবার ডক্টর ঘোষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো।

আবার তাঁকে কোন সুযোগ না দিয়েই শেঠজী বলতে শুরু করলেন, ডক্টর ঘোষ, আশা করি আপনি আর সে ভুল করবেন না। আপনার বয়েস অল্প, আপনার মনে উচ্চাকাঙ্খা আছে, আপনি ইচ্ছে করলে কি না করতে পারেন! আপনার হাতে আজ যে ক্ষমতা আছে তা পৃথিবীর আর কারুর কাছে নেই! আপনি বোধকরি জানেন সে-খবর।

তাই আমি যেই সংবাদ পেলুম যে, আপনি অধ্যাপক রাহার

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

সমস্ত বৈজ্ঞানিক-গবেষণার উত্তরাধিকারী হয়েছেন, অমনি আমি ছুটে গেলুম আমার বন্ধুদের কাছে এবং আপনি যে কি অমূল্য সম্পত্তি লাভ করেছেন সে-কথা সকলকে বুঝিয়ে বললুম। তারা ত' শুনে অবাক! আমার বন্ধুরা জানে আমার গভীর দূরদৃষ্টির কথা। তাই আমরা স্থির করলুম যে, আমরা একটা নূতন কোম্পানী গড়'বো, যার নাম হ'বে, 'মঙ্গলগ্রহ বিজ্ঞান অনুসন্ধানী লিমিটেড।' আমরা ইচ্ছে করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছ'কোটি টাকা বার ক'রে দিতে পারি। আমরা যে-কোন জিনিস 'পেটেণ্ট' করতে প্রস্তুত আছি, তাছাড়া—কারখানা তৈরী, কল বসানো, বড়-বড় যন্ত্রপাতি আমদানী করা—এক-কথায় মঙ্গলগ্রহ থেকে আপনি যা-যা বৈজ্ঞানিক-তথ্য সংগ্রহ করেছেন অথবা করবেন, সেইগুলোকে বিরাট বাণিজ্য-শিল্পে পরিণত করার জন্য যে-রকমের কল-কব্জা যন্ত্রপাতির দরকার সমস্তই আমরা এই মুহূর্ত্তে করতে প্রস্তুত আছি।

ডক্টর ঘোষ এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিলেন সেই মাড়োয়ারী-নন্দনের মুখের কথা। এতক্ষণে তাঁর মনের ভাবটা তিনি স্পষ্ট অনুমান করতে পারলেন। তাই শেঠজীর এই অস্বাভাবিক উত্তেজনাকে একটু দমন করবার জন্যে তিনি কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেঠজীর চোখের সামনে তখন কুবেরের ঐশ্বর্য্য সহস্র দ্বার খুলে এমনভাবে তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল যে, তিনি ডক্টর ঘোষের সে-কথা শুনতেই পেলেন না।

আপনি আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজী আছেন কিনা? :৪১ পৃষ্ঠা

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

আপনার মনে ব'লে চললেন—আর আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা করবো আপনাকে, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন এই পদ অধিকার ক'রে থাকবেন। আপনি আজ পর্য্যন্ত যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তার মূল্য-বাবদ আমরা এই মুহূর্ত্তে আপনাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চেক দিচ্ছি এবং এছাড়া প্রতি বছর আমরা আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক-স্বরূপ দশ লক্ষ টাকা ক'রে বেতন দেবো এবং প্রথমটা দশ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ থাকবো।

এই পর্য্যন্ত ব'লে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ক'রে হেসে উঠে শেঠজী বললেন, ডক্টর ঘোষ, আপনি ত' ধনী লোক! আপনার মত ধনী লোক পৃথিবীতে কটা আছে। দেখবেন, শীগ্‌গিরই পৃথিবীর সমস্ত ধনদৌলত আপনার হবে, শুধু যদি আপনি একবার মুখে বলেন—"হ্যাঁ, আমি রাজী আছি"

এই ব'লে শেঠ ধনীরাম ভাগরওয়ালা ডক্টর ঘোষের মুখের দিকে পরম আগ্রহে চেয়ে রইলেন।

ডক্টর ঘোষ ধীরে-ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শেঠজী, আপনার এ প্রস্তাবের জন্য বহু ধন্যবাদ, কিন্তু এটা গ্রহণ করতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, কেননা, আমি যে জিনিসের উত্তরাধিকারী হয়েছি তা বিক্রি করবার আমার কোন অধিকার নেই।

যেমন এই কথা বলা, সঙ্গে-সঙ্গে শেঠজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে হ'লো যেন তাঁর দমবন্ধ হয়ে গেছে। সামনে একটা বজ্রপাত হলেও বোধকরি তিনি এতটা বিস্ময়াভিভূত হতেন না। তাই কিছুক্ষণ বোবার মত চেয়ে থেকে শেষে অতি কষ্টে যেন নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, আপনি অস্বীকার করছেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং বছরে দশ লক্ষ টাকা বেতন ? এ্যাঁ ! বলেন কি ?

বলতে-বলতে শেঠজী এমনভাবে চেয়ারের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, যেন মনে হ'লো, হতাশায় তাঁর সমস্ত দেহ ভেঙে-চুরে গেছে। এত টাকার লোভ যে একটা লোক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করতে পারে তা তিনি জীবনে কোনদিন ভাবতেই পারেননি। তাই আরো কয়েক-মিনিট চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ডক্টর ঘোষ, ভালো ক'রে ভেবে দেখুন—না হয় আমি কাল আর-একবার আসবো।

ডক্টর ঘোষ উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, এর মধ্যে আর ভাববার কিছু নেই শেঠজী—আমি বাজে কথা কখনো বলি না। যা বলাবো তার এক বিন্দু কোনদিন নড়চড় হবে না জানবেন।

শেঠজী যেন আরো শুকিয়ে গেলেন। তাই আর ব'সে থাকা বৃথা মনে ক'রে তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ডক্টর ঘোষকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন।

বাইরে মোটর ছাড়ার শব্দ হতেই ডক্টর ঘোষ জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, একটা বিরাট 'রোলস্-রয়েস'

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

গাড়ীতে চেপে শেঠজী এসেছিলেন। কাজেই তিনি যে খুব ধনী সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না।

কিন্তু ধনীরাম বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর ঘোষের মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'লো। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই লোকটা হয়ত অধ্যাপক রাহাকেও এইরকম একটা কিছু প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তিনিও অস্বীকার করেছিলেন! সেইজন্যেই হয়ত সেই কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্যের কথা বলেই ধনীরাম তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, যদি তিনি অস্বীকার করেন এই আশঙ্কায়!

এই কথা চিন্তা করতে-করতে সহসা তাঁর মনে হ'লো, তারপর হয়ত এইভাবে অধ্যাপক রাহার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা তখন অসৎ উপায়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক-গবেষণাগুলি হস্তগত করতে চেষ্টা করেছিল—প্রথমে হয়ত চুরি করতে এসেছিল, কিন্তু তাতেও অকৃতকার্য্য হয়ে শেষে হয়ত তাঁকে খুন করেছিল এরাই!

তাই যদি হয়, তাহ'লে অধ্যাপক রাহার আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে হয়ত এর কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব! কে জানে!

এই মনে ক'রে তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে টেলিফোন করলেন। এবং সমস্ত ঘটনা বড় সাহেবের নিকট একে-একে বিবৃত ক'রে তাঁকে বললেন এই ধনীরামের ওপর কড়া নজর রাখতে।
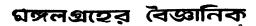
বলাবাহুল্য, বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলেন এই ধনীব্যবসায়ীর পিছনে। এছাড়া দু'একটি সখের গোয়েন্দাকেও ডক্টর ঘোষ নিজে এই কাজে নিযুক্ত করলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এইভাবে আরো তিনমাস কেটে গেল। কিন্তু অধ্যাপক রাহার হত্যারহস্যের কোন সন্ধান তখনো পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। গোয়েন্দাবিভাগের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নানারকম সুত্র ধ'রে সন্দেহের অসংখ্য খুঁটিনাটি বিচার করতে-করতে হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে সরকারী-কর্ম্মচারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগল। কত লোককে তারা ইতিমধ্যে ধরলে, আবার কত লোককে ছেড়ে দিলে সঠিক প্রমাণের অভাবে। যার ওপর সন্দেহ জন্মায়, তারই পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকে ছদ্মবেশে এই গোয়েন্দারা। অদ্ভুত তাদের কর্ম্মতৎপরতা! কিন্তু এত করেও তখনো পর্য্যন্ত কে, বা কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তার কোন প্রমাণ তারা সংগ্রহ করতে পারলে না। পাঁচ বছর, সাত বছর, দশ বছর, কখনো-কখনো-বা তার চেয়েও বেশীদিন পরে আসামী ধরা পড়েছে এ-রকম বহু 'কেস' গোয়েন্দাবিভাগে 'রেকর্ড' হয়েছে এ-কথা ডক্টর ঘোষ জানতেন,

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তবুও যত দেরী হতে লাগল, ততই তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। কেননা, তাড়াতাড়ি আসামী ধরা পড়লে এক-রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, তারা কে এবং কি তাদের উদ্দেশ্য। আর তা বোঝা গেলে ভবিষ্যত সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া যায়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তারা ধরা না পড়ে ততদিন পর্য্যন্ত ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, কি জানি কখন কোনদিক দিয়ে আবার তারা আসে, এইজন্যে সর্ব্বদা দুশ্চিন্তার আর অন্ত থাকে না। ডক্টর ঘোষ তাই সকল সময় অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতেন।

কেষ্ট মুখার্জ্জী নামে একটি যুবক ডক্টর ঘোষের সহকারী ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে আরো একমাস পরে ডক্টর ঘোষ নূতন-নূতন বহু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব ভাল কারীগর; বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতি নিজে হাতে তৈরী করতে পারতেন। এদিকে তাঁর অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল। অধ্যাপক রাহা ও মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক যে-সব যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে থেকে যেগুলি বিলাত ও আমেরিকা থেকে পাওয়া যায়, ডক্টর ঘোষ তা আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং বাকিগুলি তৈরী করতে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের দু'একটি কারখানায়। কিন্তু ভারতবর্ষের এইসব যন্ত্র-নির্ম্মাণশালা যখন বহুদিন চেষ্টা করবার পর জানিয়ে দিলে যে, তাদের দ্বারা এগুলি তৈরী করা সম্ভব হবে না, তখন ডক্টর ঘোষ মাথায় হাত দিয়ে

পড়লেন। সেগুলি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে তৈরী করাতে গেলে তার জন্য সময় দরকার এবং যা খরচ লাগবে অত টাকা ডক্টর ঘোষের নিকট ছিল না। অথচ এই সামান্য কয়েকটা যন্ত্রপাতি হলেই ডক্টর ঘোষের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়। কি করবেন! এই ভাবতে-ভাবতে যখন তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল, এমন সময় তিনি খবর পেলেন যে, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জগদীশ বসুর নিকট এমন কয়েকটি লোক আছেন, যাঁরা অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি হাতে তৈরী করতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বৈজ্ঞানিক বসুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রয়োজনের কথা তাঁকে জানালেন। ডক্টর বসু জানতেন যে, ডক্টর ঘোষ মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তাছাড়া অধ্যাপক রাহা ছিলেন তাঁর পরম বন্ধু, তাই সেই বন্ধুর আরব্ধ কর্ম্ম যাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে এইজন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁরই একজন প্রধান সহকর্ম্মীকে ডক্টর ঘোষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে কেষ্ট মুখার্জ্জীকে ডক্টর ঘোষ লাভ করলেন। বলা বাহুল্য, চারমাস কঠিন পরিশ্রম করবার পর মিঃ মুখার্জ্জী ডক্টর ঘোষের এই কার্য্য সুসম্পন্ন ক'রে দেন।

এইসময় একদিন রাত্রে ডক্টর ঘোষ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নূতন যন্ত্রপাতিগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখলেন। প্রকাণ্ড দুই প্রতিফলনাধার, তার চারিধারে ছোট-বড় কত বাক্স, কত তার, কত জ্বলন্ত আলোর ভাবল্! তারপর অধ্যাপক রাহার সেই

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

সর্ব্বপ্রধান সতর্কবাণীটি স্মরণ করলেন। তিনি বারবার লিখে গিয়েছিলেন যে, মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রেরণ করতে গেলে সর্ব্বপ্রথম এই কথাটি একাগ্রমনে চিন্তা করতে হবে, 'Hardons grow on the shore of the Balvian sea.'

নূতন যন্ত্রের সামনে ব'সে তিন মিনিট ধ'রে ডক্টর ঘোষ সেই কথাটি স্মরণ করলেন। ব্যস্, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দেখলেন, তাঁর সমস্ত পারিপার্শ্বিক কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল…শুধু বোরোরা সেই মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক…তাঁর দুটি অন্তর্ভেদী চক্ষু দিয়ে চেয়েছিলেন তাঁর মুখের দিকে। অধ্যাপক রাহার বর্ণনা থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইনিই সেই বৈজ্ঞানিক। এতদিন তিনি শুধু তাঁর ছায়ামূর্ত্তি দূর থেকে যেন স্বপ্নের মত দেখেছিলেন, কিন্তু আজ এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে ডক্টর ঘোষ একেবারে তাঁর সামনে এসে পড়লেন। যাকে বলে মুখোমুখি—মাত্র দু'হাত দূরে তিনি বসেছিলেন। বোরোরার মুখের দিকে তাকাতেই ডক্টর ঘোষের বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠলো। তারওপর যখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর চোখের দিকে চেয়ে ধীরে-ধীরে সেই মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক তাঁর হাতটা একটি যন্ত্রের দিকে বাড়ালেন, তখনি ডক্টর ঘোষের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তাঁর মনে পড়লো সেই হতভাগ্য লোকটির কথা, যাকে অধ্যাপক রাহার চেয়ারে মৃত

অবস্থায় ব'সে থাকতে তিনি দেখেছিলেন। তাড়াতাড়ি ডক্টর ঘোষ তখন সেই লাইনটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন।

এবার কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ বোরোরা বললেন, কে তুমি? তাঁর চোখে-মুখে একটা দারুণ বিরক্তি ও সন্দেহের ভাব ফুটে উঠলো।

ডক্টর ঘোষ শিউরে উঠলেন। তারপর দ্রুতগতিতে নিজের পরিচয়, ও অধ্যাপক রাহার পরিচয় দিয়ে বললেন, কেমন ক'রে অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটেছে এবং তিনি যে চিঠিখানা লিখে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানি তখনি তাঁকে প'ড়ে শোনালেন।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, এতদিন কেবল ডক্টর ঘোষের সঙ্গে বোরোরার চিন্তার বিনিময় হয়েছিল, আজ কিন্তু প্রথম তাঁরা কথাবার্ত্তা কইলেন পরস্পরের সঙ্গে।

ডক্টর ঘোষের এই কথাগুলি বোরোরা বিশ্বাস করলেন। অধ্যাপক রাহার মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, একটি বাজে লোককে অধ্যাপক রাহার লেবরেটরীতে ঢুকতে দেখে তিনিই তাকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু অধ্যাপকের যে মৃত্যু হয়েছে এ-কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি, যদিও তখন থেকে আর তাঁর কোন খবরই তিনি পাননি।

ডক্টর ঘোষ তখন বললেন, অধ্যাপক রাহা তাঁকে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তার কথা, এবং কেমন ক'রে তিনি সেইগুলি এখন পালন করেছেন। তাছাড়া এই চারমাস ধ'রে পরিশ্রম ক'রে তিনি

যে উন্নততর যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছেন তাও তাঁকে জানালেন।

বোরোরা, ডক্টর ঘোষের এই অধ্যবসায়ের কথা শুনে তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি ফুটলো। তিনি বললেন, আপনি এই ভালো যন্ত্রটা তৈরী ক'রে খুব উপকার করেছেন, অধ্যাপক রাহার সময়ে আমায় ভীষণ পরিশ্রম করতে হতো খবর আদান-প্রদান করতে।

ডক্টর ঘোষ তখন বললেন, অধ্যাপক রাহার কতকগুলি লেখা তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি, যদি বোরোরা সেগুলি তাঁকে বুঝিয়ে দেন।

বোরোরা তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন এবং একে-একে গোড়া থেকে সব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

প্রথমেই বোরোরা ডক্টর ঘোষকে বললেন, মঙ্গলগ্রহের ভৌগোলিক অবস্থা—তার পাহাড় পর্ব্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল ও প্রাণীজগতের কথা ; তারপর তার গ্রহ-উপগ্রহ, ঋতু পরিবর্ত্তন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, আর সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান যে সেখানে কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং পৃথিবীর সঙ্গে কোথায় তাদের প্রভেদ সে-কথাও বললেন। সব শুনে ডক্টর ঘোষ একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

অবশ্য এইসব জিনিস ডক্টর ঘোষ একদিনেই জানতে পারেন-নি। রাতের পর রাত জেগে বসে সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

বোরোরার কাছ থেকে সব শুনেছিলেন। এক-একদিন রাত্তির চারটে বেজে যেতো; রাত্তির দশটা-এগারোটায় আরম্ভ করলে, ভোরও হয়ে যেতো।

এইভাবে কঠিন পরিশ্রম ক'রে ডক্টর ঘোষ ছাত্রের মত পরম ধৈর্য্য সহকারে সেই অজ্ঞাত-জগতের সমস্ত খবর সংগ্রহ ক [illegible]।

এদিকে শত্রুদের আক্রমণ সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। যদিও তারা প্রত্যক্ষভাবে ডক্টর ঘোষের কোন অনিষ্ট করেনি, তথাপি তিনি যেন আশঙ্কা করতেন, যে-কোন মুহূর্ত্তে তারা আসতে পারে। তাই লেবরেটরী বাড়ীর চারিদিক তিনি বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘিরে রেখে দিয়েছিলেন। হঠাৎ কেউ স্পর্শ করলেই মৃত্যু। একা সারারাত জেগে ডক্টর ঘোষ এই গবেষণা চালাতেন। একজন চাকর ও একজন দরোয়ান থাকতো সেখানে। কিন্তু তারা অধিকাংশ দিনই ঘুমিয়ে পড়তো। নিশুতরাতে হঠাৎ কোন শব্দ শুনলেই ডক্টর ঘোষ চমকে উঠতেন এবং তখনি তাড়াতাড়ি চাকর ও দরোয়ানকে ডেকে চারিদিক অনুসন্ধান করতে হুকুম দিতেন। তারা সদ্য ঘুম ভেঙে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতো, তারপর কোথাও কোন-কিছু দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে আসতো। তারা বিরক্ত হতো মনে-মনে তাদের মনিবের এই অকারণ ভীতি দেখে।

এমনি ক'রে যখন ডক্টর ঘোষের দিন কাটছিল তখন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। একদিন ভোরবেলা ডক্টর ঘোষের

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞ

স্ত্রী ছুটতে-ছুটতে লেবরেটরীতে এসে বললেন, ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে, দিদিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! দিদি—অর্থাৎ অধ্যাপক রাহার স্ত্রী।

সেকি! ব'লে ডক্টর ঘোষ তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরে গেলেন এবং যে-ঘরে অধ্যাপক রাহার স্ত্রী থাকতেন তার চারিপাশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কয়েকটা লোকের পদচিহ্ন দেখেই তাঁর বুঝতে বাকী রইল না, ব্যাপারটা কি। তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন তাই হ'লো। শত্রুরা তাঁর ওপর কোন অত্যাচার করবার সুযোগ না পেয়ে তখন এইদিক দিয়ে আক্রমণ শুরু করলে। ডক্টর ঘোষ সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে খবর দিলেন। তারা এসে সব লিখে নিয়ে গেল এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে কয়েক টুকরো জিনিস সংগ্রহ করলে। স্ত্রীলোকের মাথার একগুচ্ছ চুল, অধ্যাপক রাহার স্ত্রী যে থান কাপড় পড়তেন তার কিছু ছিন্ন অংশ। এইসব থেকেই তাদের ধারণা দৃঢ় হলো যে, জোর-জবরদস্তি ক'রে একদল দস্যু তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

অধ্যাপক রাহার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তখন খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো ডক্টর ঘোষের মনে। এর পেছনেও হয়ত ধনীরামের দলের কোন ষড়যন্ত্র আছে, তারা হয়ত মনে করেছে, এঁর স্বামীর অনেক-কিছু গোপনীয় তথ্য ভয় দেখিয়ে এই মহিলাটির কাছ থেকে বার ক'রে নিতে পারবে! যাই হোক,

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

পুলিশকে খবর দিয়ে এবং আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকে খোঁজ-খবর নিতে ব'লে সেইদিন রাত্রেই ডক্টর ঘোষ এই খবরটি বোরোরাকে জানালেন।

বোরোরা এ-সব খবর আগে কিছুই শোনেন নি। তিনি তখন ধনীরামের দলের সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ডক্টর ঘোষকে জিগ্যেস করলেন। এই ধনীরামের কথাটা তিনি আগে তাকে বলেন নি ব'লে মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ডক্টর ঘোষকে তিনি বললেন, আচ্ছা, এ-সম্বন্ধে আমি কাল আপনাকে জানাবো।

পরের দিন ডক্টর খোষকে বোরোরা বললেন, কিছু ভয় নেই, এই বৃদ্ধ মহিলাকে তারা প্রাণে মারবে না, শুধু ভয় দেখিয়ে মঙ্গলগ্রহের কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ তাঁর কাছ থেকে তারা আদায় করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অধ্যাপক রাহার স্ত্রী কিছুই জানেন না, বড়-জোর তিনি বলতে পারবেন তাঁর স্বামীর গবেষণার কথা, ব্যস্। তাতে আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না। অধ্যাপক অন্তত আমাকে সেইরকমই বলেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী এইটুকু ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

ডক্টর ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমি যে কতদূর অগ্রসর হয়েছি সে-সম্বন্ধে কিছু-কিছু তিনি আমার মুখ থেকে শুনেছিলেন। তাতে কোন ভয় নেই ত' !

বোরোরা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়েদের কাছে আপনি এ-সব কথা গল্প করতে জান কেন, জানেন

ত' তাদের পেটে কোন কথা থাকে না।

ডক্টর ঘোষ বললেন, তাঁর স্বামীর আরব্ধ কর্ম্ম আমি কি-রকম বিশ্বস্তভাবে করছি তার প্রমাণ দেবার জন্যে কিছু-কিছু তাঁকে ব'লে ফেলেছিলুম, ভেবেছিলুম তার দ্বারা আমার প্রতি হয়ত আরো শ্রদ্ধা তাঁর বাড়বে। তখন কে জানতো যে, এর জন্যে একদিন বিপদ বাড়তে পারে।

বোরোরা এবার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কয়েক মিনিট চুপচাপ ব'সে রইলেন, মনে হলো যেন তিনি কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, কোনরকম ক'রে এই ধনীরাম লোকটাকে ধ'রে এনে আপনার এই চেয়ারে একবার বসিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে আমি তার মনের কথাটা একবার ভাল ক'রে বুঝে দেখি—সে কি করতে চায়? অন্তত ঘণ্টা-দুই তাকে এই যন্ত্রপাতিগুলোর সামনে একলা বেঁধে রাখতে পারলেই আমি কাজ শেষ ক'রে নেবো।

বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, একলা থাকলেই সে চিন্তা করতে বাধ্য হবে, আর তাহলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সে তার মনের কথা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তখন আমরা কি করতে হবে ভেবে দেখবো। যদি সে অপরাধী হয়, তাহ'লে আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে, মৃত্যুর চেয়ে তা হবে ভীষণ। একেবারে প্রাণে মেরে ফেললে আপনি বিপদে পড়বেন, কেননা পুলিশ

এসে নানারকম হাঙ্গামা-হুজ্জুত ক'রে আপনাকে নিয়ে হয়ত টানাটানি করবে। অবশ্য, ওখানকার ডাক্তারের সাধ্য নেই যে, তার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করে, তবুও আপনার ওপর কেমন একটা সন্দেহ তাদের রয়ে যাবে, সেটা আমি করতে চাই না। শুধু তাকে এনে আমার কাছে ছেড়ে দিন, সে জানতেও পারবে না, আমি তার কাছ থেকে কি জানতে চাই।

এইসব বলতে-বলতে হঠাৎ আবার বোরোরা নিরুৎসাহে ভেঙে পড়লেন। তিনি বললেন, কিন্তু যদি ধনীরাম ইংরিজীতে চিন্তা না করে, তাহলেই ত' বিপদ—আমি ত' ইংরিজী ছাড়া অন্য ভাষা জানিনা। পরমুহূর্তেই আবার উৎসাহিত হয়ে বোরোরা বললেন, আচ্ছা, তার জন্যে কোন চিন্তা নেই—সে ব্যবস্থাও আমি করতে পারবো। এই ব'লে তিনি চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে কেষ্ট মুখার্জ্জী আসতেই ডক্টর ঘোষ তাঁকে বললেন, ধনীরামকে কোনরকম ক'রে ধরে আনতে হবে এখানে।

ব্যাপার কি? বলে মিঃ মুখার্জ্জী তখন ডক্টর ঘোষের কাছ থেকে সব শুনলেন, মিঃ মুখার্জ্জী সেই থেকে তাঁর কাছেই কাজ করছিলেন। অতি বিশ্বাসী তিনি। ডক্টর ঘোষ তাঁর ওপর বন্ধুর মত নির্ভর করতেন। মিঃ মুখার্জ্জী দু'দিন ধরে কেবল অধ্যাপক রাহার স্ত্রীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

তিনি ধনীরাম শেঠের বাড়ীর আশে-পাশে লুকিয়ে থেকে, চাকর-বাকরদের ঘুস খাইয়ে, এই খবরটা তখন সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক তার সেই বাড়ীতে নেই।

কিন্তু ডক্টর ঘোষের মুখে সব শুনে মিঃ মুখার্জ্জী বললেন, ও, এই কথা? তা, এর জন্যে এত ভাবছেন কেন আপনি? তাকে একদিন কয়েকটা গুণ্ডা দিয়ে আমি এখানে ধ'রে আনতে পারি।

ডক্টর ঘোষ বললেন, না, তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না, আমি তাকে এখানে আনাবো'খন, কিন্তু তোমাকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে, আমি ইসারা করার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত পা বেঁধে ফেলতে হবে এই চেয়ারের সঙ্গে। একলা আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

মিঃ মুখার্জ্জী বললেন, তাঁকে এখানে আনাই ত' শক্ত, কি ক'রে আপনি এই কাজটা করবেন?

ডক্টর ঘোষ বললেন, ধনীরাম ত' আমাকে বলেই গিয়েছিল, যদি মত পরিবর্ত্তন করেন ত' আমায় আবার ডেকে পাঠাবেন, আমি আসবো। ব্যস্, আমি এখনি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি মত পরিবর্ত্তন করেছি ব'লে—তাহ'লেই কেল্লা মাত্।

এই ব'লে একটা চিঠি লিখে খামে মুড়ে তখনি ডক্টর ঘোষ মিঃ মুখার্জ্জীর হাতে দিলেন।

মুখার্জ্জী তৎক্ষণাৎ ছুটলো ধনীরাম শেঠের বাড়ীর দিকে। চিঠিতে লেখা ছিল, আজ রাত্তির এগারোটার সময় একবার আসবেন কি? বিশেষ কথা আছে—আমি আপনার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চিঠি পেয়ে ধনীরাম লাফিয়ে উঠলো। তবে রাত্তির ১১টায় শুনে হঠাৎ তার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হলো, এ-সব গোপনীয় ব্যাপার নির্জ্জনে হওয়াই শ্রেয়, তাই বোধহয় এত রাত্রে যেতে লিখেছেন।

যাই হোক, সেইদিনই রাত এগারোটার সময় শেঠ ধনীরাম এসে হাজির হলেন। ডক্টর ঘোষ আগে থেকে যন্ত্রপাতিগুলো সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, চলুন আমরা লেবরেটরী-ঘরে যাই, সেখানে কেউ নেই, কথাবার্ত্তার সুবিধে ত' হবেই, তাছাড়া আমার লেবরেটরী ত' আপনি দেখেননি, সেটাও চোখে দেখতে পাবেন।

পরম উৎসাহে ধনীরাম বললে, বেশ, বেশ, চলুন, ভিতরেই যাওয়া যাক।

ভিতরে যেতেই আসল চেয়ারটা দেখিয়ে ডক্টর ঘোষ তাতে ধনীরামকে বসতে বললেন। তার পাশে আর-একখানা চেয়ার

ছিল, ধনীরাম সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ডক্টর ঘোষকে আসল চেয়ারটায় বসতে বললে। ডক্টর ঘোষ সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, না না, এটায় আপনি বসুন, আমি ওটায় বসছি। কিন্তু ধনীরাম কোনটায় বসবেন ঠিক করতে না পেরে যেন একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে, জোর ক'রে মিঃ মুখার্জ্জী পিছন দিক থেকে তাকে টেনে ধ'রে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। মিঃ মুখার্জ্জী পিছনে যন্ত্রপাতির আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর ঘোষও তার ওপর বলপ্রয়োগ করলেন। তখন দু'জনে মিলে তাকে সেই চেয়ারের সঙ্গে বেশ ক'রে বেঁধে ফেললেন। ধনীরাম চেঁচিয়ে উঠলো, এর মানে কি, আপনারা কি আমায় খুন করবেন। পুলিশ? পুলিশ?

দু'বার চেঁচাতেই মিঃ মুখার্জ্জী রুমাল দিয়ে তার মুখটা বেঁধে ফেললেন, আর ডক্টর ঘোষ তৎক্ষণাৎ চেয়ারের দু'পাশ থেকে দু'টো খুব জোরালো আলো জ্বেলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই আলোর তীব্র রশ্মি একটা ধনীরামের কপালে, আর-একটা মাথার পশ্চাদভাগে গিয়ে পড়লো। তারপর সেই ঘরে একলা ধনীরাম শেঠকে রেখে তাঁরা দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দু'ঘণ্টা পরে মিঃ মুখার্জ্জী ও ডক্টর ঘোষ ঘরে ঢুকে ধনীরামের বাঁধন খুলে দিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে ঘর থেকে

বার ক'রে দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ধনীরাম সুড়-সুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে চাপলো, কিন্তু একটি কথাও তাঁদের কাউকে বললে না।

তৎক্ষণাৎ ডক্টর ঘোষ সেই চেয়ারটায় এসে বসলেন এবং বোরোরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করলেন।

বোরোরার মুখ গম্ভীর। তিনি এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না ক'রে বললেন, এই ধনীরাম লোকটি খুব সাংঘাতিক। আমি এই দু'ঘণ্টা ধ'রে তার চিন্তাধারার একটা রেকর্ড তুলে নিয়েছি। প্রথমটা লোকটা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল বুঝি আপনি তাকে মেরে ফেলবেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার সে ভয় কেটে যায় এবং সে চুপচাপ চিন্তা করতে থাকে।

তারপর বোরোরা বললেন, তার সম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা করবার আগে বড়বাজারের শতলা গলির ৬০৩ নম্বরের বাড়ীতে এখনি কাউকে পাঠিয়ে দিন, সেখানে অধ্যাপক রাহার স্ত্রী তিন-তলার একটা ঘরে ব'সে আছেন। তার কাছে মাত্র একটি স্ত্রীলোক পাহারায় আছে, তাছাড়া আর কেউ নেই।

ডক্টর ঘোষ সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ মুখার্জ্জীকে সেই ঠিকানায় পুলিশ নিয়ে যেতে বললেন। মুখার্জ্জী তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

তখন আবার তিনি বোরোরার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। বোরোরা বললেন, এইবার ধনীরামের সম্বন্ধে যা জেনেছি বলা যাক।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ধনীরাম লোকটার কিন্তু নিজের ওপর কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, সে এমন একটা দেশের হয়ে কাজ করছে, যারা নাকি সমস্ত জগতের ওপর প্রভুত্ব করতে চায়, আর সেইজন্যে তাদের এই মঙ্গলগ্রহের কিছু সংবাদের বিশেষ প্রয়োজন। বোরোরা বললেন, এবং এই সংবাদটি, ধনীরামের বিশ্বাস, আপনার কাছে আছে। তাই যদি সে কোনরকমে এই খবরটি না পায় তাহ'লে আপনার এবং তার সঙ্গে আপনার বন্ধুর মৃত্যু সুনিশ্চিত জানবেন, আপনাদের মৃত্যুর পরোয়ানা সই হয়ে গেছে। তাছাড়া আপনার এবং আপনার বন্ধুর বাড়ী এর জন্যে হয়ত তারা আক্রমণ করতে পারে এবং আপনাদের সমস্ত যন্ত্রপাতি সেখান থেকে বাক্স বোঝাই হয়ে হয়ত দেরাদূনের কোন-এক বাড়ীতে উধাও হয়ে যেতে পারে। তারপর সেখান থেকে আবার এইগুলি বিমানপোতের সাহায্যে ভারতবর্ষের বাইরে কোন-এক সুদূর অঞ্চলে চালান দেওয়া হবে।

উত্তেজিতকণ্ঠে বোরোরা ব'লে চললেন, আমার মনে হয়, এর জন্যে শেঠ ধনীরামের এমন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে, যাতে বহু বিদেশী গোয়েন্দাও কাজ করে। কিন্তু সে এখন আপনার ওপর তাদের কাজে লাগাতে খুব উৎসুক নয়, কেননা, পরে তাদের দ্বারা আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। ধনীরাম মনে-মনে একথা স্বীকার যে, সে-ই একদল গুণ্ডা

লাগিয়ে অধ্যাপক রাহার মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং এই দলই সে আবার লাগিয়ে দেবে আপনার পিছনে। অবশ্য, অধ্যাপক রাহার স্ত্রীর কাছ থেকে এখনো সে কোন খবরই আদায় করতে পারেনি। তাই সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে রয়েছে তাঁর ওপর এবং মনে-মনে চিন্তা করছে একটা লোহা পুড়িয়ে তাঁর গায়ে ছেঁকা দিলে সেকথা বারকরা যাবে কিনা।

এইপর্য্যন্ত ব'লে একটু থেমে মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, এছাড়া, যে বৈদেশিক শক্তি শেঠ ধনারামকে এর জন্যে খরচ জোগাচ্ছে, তারা আশা করছে, খুব শিগগিরই একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধবে আপনাদের রাজার সঙ্গে। তারপর আরো দু'টি বিরাট শক্তি তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে নিমেষে একত্রে কাজ করবে, আর এর জন্যে বাল্‌টিক-উপসাগরে ডুবো-জাহাজের এক শক্তিশালী বাহিনী সেজেগুজে অপেক্ষা করছে।

আর তার তীরে-তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বহু বোমারু বিমান, মারাত্মক গ্যাসপূর্ণ সব বোমা নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

তারা এ-রকম পরিকল্পনা ক'রে রেখেছে যে, যেই আপনাদের কোন যুদ্ধ-জাহাজ অগ্রসর হবে, অমনি তারা সেইসব ডুবো-জাহাজ দিয়ে তাদের ঘায়েল করবে; আর সঙ্গে-সঙ্গে সেইসব বোমারু-বিমান উড়ে গিয়ে বোমা বর্ষণ ক'রে আসবে লণ্ডনের ওপর, অন্যান্য বড়-বড় সহরের ওপর; এবং তারপর তারা আপনাদের রেল-লাইন, ও বিমান ঘাঁটিগুলি সব ধ্বংস করবে। এর জন্যে

তারা মাইনে-করা বহু লোক রেখেছে, তাদের কাজ শুধু দেশে-দেশে গিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালা। বিমান-আক্রমণের মাস-কয়েক আগে থেকেই তারা এই প্রচারকার্য্য শুরু ক'রে দেয় ভদ্র ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে। এছাড়া তাদের এমন বহু গোয়েন্দা আরো আছে, যাদের ওপর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে—রেলের পুল, ট্রেন, সৈন্যদের ঘাঁটি এবং বন্দরে বন্দরে যে-সব জাহাজ বাঁধা থাকবে তাদের বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিতে হবে।

অনেক বছর ধ'রে তাদের মধ্যে গোপনে-গোপনে এই যুদ্ধের আয়োজন চলছে এবং শেঠ ধনীরামের বিশ্বাস, এ-খবর আপনাদের গবর্ণমেণ্ট কিছুই জানে না। তারা একইসঙ্গে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাবে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের উপনিবেশগুলির ওপর পর্য্যন্ত। তারি সূচনা-স্বরূপ রাজদ্রোহের আগুন তারা দাউ-দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ইজিপ্টে এবং বহু স্বাধীন করদরাজ্যে। বহুদিন পূর্ব্বেই তারা এই আক্রমণ শুরু করতো, কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে অধ্যাপক রাহার সংবাদ আদান-প্রদানের খবর পেয়েই তারা একটু ঘাবড়ে যায় এবং যুদ্ধ স্থগিত রাখে। কেননা তারা জানতো যে, মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকদের কাছে ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র যেমন আছে, তেমনি তার প্রতিকারও আছে অসাধারণ। কাজেই বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের

হাতে যদি কোনক্রমে সেইগুলি এসে পড়ে তাহ'লে তাদের সঙ্গে যুঝে ওঠা দায়!

তাই তারা বহুদিন ধ'রে চেষ্টা করছে এইসব যন্ত্রপাতি-গুলো হস্তগত ক'রে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ স্থাপন করবার। অধ্যাপক রাহার মৃত্যু সেইজন্যেই হয়েছে এবং আপনার মুণ্ডের প্রতিও তারা লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কোনরকমে আপনাকে হটিয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো তারা তাদের নির্দ্দিষ্টস্থানে নিয়ে যাবে, তারপর মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে—এই হলো তাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য। এই ব'লে 'বোরোরা' ডক্টর ঘোষের মুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন এবং ডক্টর ঘোষকে খুব চিন্তান্বিত দেখে মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক বললেন, ভয় পাবেন না, মঙ্গলগ্রহের ইচ্ছার ওপর নির্ভর ক'রে এইসব সংবাদ আদান-প্রদান করা, তারা ত' যাকে-তাকে খবর দেয় না। কাজেই 'নার্ভাস' হবেন না। এখন এর মধ্যে সব-চেয়ে দরকারী যে-কাজটা তা আপনাকেই করতে হবে।

ডক্টর ঘোষ এই কথা শুনে পরম উৎসাহভরে বললেন, কি সেই কাজ?

বোরোরা বললেন, এখনি আপনি আপনাদের সৈন্য-বিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের সকলকে এই সংবাদটি জানিয়ে দিন। তাদের বলুন, ভিতরে-ভিতরে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে, সর্ব্বনাশের এই আগুন একদিন সারা পৃথিবীকে গ্রাস ক'রে

ফেলবে, কাজেই এখনি খোঁজ-খবর না নিলে, পরে অনুতাপ করবারও সময় থাক্‌বে না।

ডক্টর ঘোষ সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, বেশ, আমি এখনি তাদের কাছে এই সংবাদ দিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে তিনি উঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় বোরোরা বললেন, ডক্টর ঘোষ, আপনি কিন্তু নিজেকে এবং আপনার পরিবারবর্গকেও খুব সাবধানে রাখ্‌বেন আর এর জন্যে আপনি পুলিসের সাহায্য নিতে দেরী করবেন না। কেননা, বিপদ হ'তে কতক্ষণ! শেঠ ধনীরাম এখন অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার মনিবদের কাছ থেকে সে বহু টাকা খেয়েছে, তারা এখন এই সংবাদটির জন্যে তাকে খুব চাপ দিচ্ছে, কাজেই কখন সে কি ক'রে বসবে বলা যায় না!

বোরোরার কাছ থেকে এইসব সংবাদ পেয়ে ডক্টর ঘোষ হাঁপাতে লাগলেন। কেবল নিজের বিপদ হ'লে তিনি কখনো এত ভয় করতেন না, তবে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে যে বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের সূচনা হয়েছে, তারি ভয়াবহ মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন!

ডক্টর ঘোষ তাই একাকী ব'সে ভাবতে লাগলেন। কি ক'রে তিনি তাঁর এই লেবরেটরীকে রক্ষা করবেন! সেই গুণ্ডার দল যদি এই মুহূর্ত্তে এসে আক্রমণ করে তাহ'লে তিনি আটকাবেন কি ক'রে? মিঃ মুখার্জ্জীও এখনো ফেরেন নি, তিনি গিয়েছেন

অধ্যাপক রাহার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে। কার সঙ্গেই-বা পরামর্শ করেন এখন। এইসব ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আবার তাঁর মনে বল আসে—তিনি একজন বৃটিশ-প্রজা, যে রাজ্যে সূর্য্য কখনো অস্তমিত হয় না, সেই বিপুল বৃটিশ-সাম্রাজ্যের তিনি প্রজা, তাঁর পিছনে রয়েছে সেই বিরাট রাজশক্তি, যা নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলিকে শাসন করছে। তবে ভয় কি? কার সাধ্য তাঁর অনিষ্ট করে! তাছাড়া ডক্টর ঘোষ ভাবলেন, তিনি যে শত্রুদের এই গোপন উদ্দেশ্যটি এইমাত্র জানতে পেরেছেন, তা ত' আর তারা কেউ জানেনা, কাজেই এখনি এত আশঙ্কা করার কি কারণ থাকতে পারে। যদিও শত্রুদের তাঁর বাড়ীটির ওপর নজর আছে, তথাপি তাঁরা যে এইমাত্র তাদের সব প্ল্যান আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন তা তারা জানবে কি ক'রে?

এই ভেবে তিনি স্থির করলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে এই বিপদের খবরটা দেশবাসীদের জানানো তাঁর কর্ত্তব্য। সমগ্র জাতিকে তিনি সতর্ক ক'রে দেবেন এই আসন্ন প্রলয়ের কথা ব'লে। একবার ভাবলেন, এখুনি টেলিফোন করেন। আবার ভাবলেন, না, তাহ'লে কেই-বা তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে? হয়ত পাগলের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দেবে। তাই তিনি নিজে গিয়ে সেই খবরটি দিয়ে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু কার কাছে যাবেন? এখন প্রায় রাত দুপুর। ভাবলেন, প্রধান মন্ত্রীর কাছে কি আগে যাবেন? তিনি কি কলকাতায় আছেন? আবার ভাবলেন, এই রাত্রে না

গিয়ে সকালে গেলে কি রকম হয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে হলো, যদি ধনীরামের দল এখনি কাজ সুরু করে দেয়, তাহ'লে ত' এই খবরটা দেশবাসীকে জানানোই হবে না। কি জানি যদি তাঁকে তারা আজই রাত্রে মেরে ফেলে। কে বলতে পারে ?

তাই আর দেরী না ক'রে তিনি চুপি-চুপি লেবারেটরী-ঘরে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর মোটরগাড়ীটা নিয়ে মিঃ মুখার্জ্জী, অধ্যাপক রাহার স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন, সেইজন্য একটা ট্যাক্সিতে চেপে তিনি রওনা হলেন।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। আগে কার কাছে গিয়ে এই খবর দেবেন ? অনেক ভেবে তিনি সোজা একেবারে পুলিসের কোয়ার্টার লালবাজারে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই একজন ইনস্‌পেক্টর ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি চান ?

ডক্টর ঘোষ তখন নিজের পরিচয় দিলেন, তারপর একবার পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাত করবার বাসনা জ্ঞাপন করলেন। তিনি বললেন, এমন বিশেষ জরুরী একটা খবর আছে, যা তিনি কেবলমাত্র কমিশনার সাহেবকেই বলতে চান।

পুলিশকর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ এইরকম অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দেন না, বিশেষ ক'রে আবার এত রাত্রে, কিন্তু সৌভাগ্য-

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

বশতঃ পুলিসের সেই ইনস্‌পেক্টারটি জানতেন যে, ডক্টর ঘোষ একজন বড় বৈজ্ঞানিক এবং মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে তিনি পৃথিবীর এক অদ্ভুত মিলন সাধনের চেষ্টা করছেন। তাই ডক্টর ঘোষের মুখে-চোখে একটা ঘনায়মান আশঙ্কার ছায়া দেখে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে গিয়ে ভিতরের একটা ঘরে বসালেন, তারপর তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে কমিশনার সাহেবকে খবর দেবার জন্য অন্যত্র চলে গেলেন! মিনিট পনেরো পরে পুলিশ-কমিশনার সাহেবের ঘরে তার ডাক পড়লো। ডক্টর ঘোষ অভিবাদন ক'রে ঘরে ঢুকতেই তিনি তাঁকে বসতে বললেন তাঁর সামনের চেয়ারে। বেঁটে, মোটা, ও মাথায় বিরাট টাকওয়ালা একটি প্রৌঢ় সাহেব তামাকের পাইপটা থেকে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আজ একটা জরুরী কাজের জন্য আমায় অফিসে সারারাত থাকতে হবে—তা নাহ'লে এ-সময় আমার সঙ্গে দেখা হতো না। তারপর আবার পাইপটায় একটা টান দিয়ে বললেন, বলুন ডক্টর ঘোষ, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি?

ডক্টর ঘোষ সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, আমার নিজের কোন উপকারের আশায় আসিনি সাহেব, আমি এসেছি সমগ্র দেশবাসীর উপকারের জন্য। তাদের জীবন-মরণ এখন নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। আজ সমগ্র মানবজাতি বিপন্ন—বাঁচান তাদের শত্রুর হাত থেকে।

কমিশনার সাহেব ত' শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

বিস্মিতকণ্ঠে তিনি বললেন, ব্যাপার কি—আপনার কথা ত' আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দেশবাসীর উপকার, সমগ্র মানব-জাতি বিপন্ন, শত্রুর হাত থেকে তাদের বাঁচান—এ সবের মানে কি? কে শত্রু? তাদের কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে একটু স্পষ্ট করে না বললে ত' কিছুই বুঝতে পারছি না।

তখন ডক্টর ঘোষ অধ্যাপক রাহার মৃত্যু থেকে আরম্ভ ক'রে, শেঠ ধনীরামের প্রসঙ্গ, অধ্যাপকের স্ত্রীর অদৃশ্য হওয়া, বোরোরার সঙ্গে যাবতীয় কথোপকথন, সব একে-একে তাঁকে বললেন।

কমিশনারসাহেব ত' তা শুনে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। অন্য কেউ এ-খবর দিলে তিনি তা কতটা বিশ্বাস করতেন জানিনা, তবে ডক্টর ঘোষের মত একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে যা শুনলেন তা তিনি আদৌ অবিশ্বাস করতে পারলেন না। উপরন্তু তিনি ডক্টর ঘোষকে বললেন, আপনার যন্ত্রপাতি সব এখন রক্ষীহীন অবস্থায় ফেলে রেখে আসা খুব অন্যায় হয়েছে।

ডক্টর ঘোষ বললেন, কেন, আমার একজন বেয়ারা ও একজন দারোয়ান ত' রয়েছে সেখানে।

কমিশনার-সাহেব বললেন, তারা কি করবে, তাদের কি সাধ্য আছে? আপনার উচিত ছিল আগে থানা থেকে একদল সশস্ত্র

পুলিশ আনিয়ে আপনার বাড়ীতে মোতায়েন করা। এই ব'লে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বালিগঞ্জের থানায় হুকুম দিলেন, একদল পাহারাওয়ালা যেন অবিলম্বে ডক্টর ঘোষের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মিনিট কয়েক চুপ ক'রে কমিশনার-সাহেব বসে রইলেন, মনে হলো যেন তিনি কি গভীর চিন্তা করেছেন।

তাঁকে চিন্তিত দেখে ডক্টর ঘোষ বললেন, আমার মনে হয়, এ-সম্বন্ধে আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়, এখনি প্রধান মন্ত্রীমহাশয়কেও খবর দেওয়া উচিত, তাছাড়া লণ্ডনের মন্ত্রীসভায়ও এ-খবর যত শীগ্‌গির পৌঁছোয় সে-বিষয়েও আপনাদের দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা, সমগ্র বৃটিশসাম্রাজ্য আজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। শত্রুদের গোপন অভিপ্রায় সম্বন্ধে এখনো কেউ কিছু জানে না, তাই যত দ্রুত এই সংবাদ শাসন-পরিষদে পৌঁছোয় ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল জানবেন।

পুলিশ-কমিশনার সাহেব বললেন, হ্যাঁ আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। যাক, যখন উভয়ে একই কথা চিন্তা করছিলুম, তখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি সর্ব্বপ্রথমে প্রধান মন্ত্রীমহাশয়কে এই সংবাদটা দিই। এই ব'লে তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে ডাকলেন। পুলিশ-কমিশনার ডাকছেন শুনে তিনি নিদ্রাত্যাগ ক'রে উঠে ফোন ধরলেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈ

ব্যাপারটার গুরুত্ব তিনিও উপলব্ধি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর সাহেবকে টেলিফোন-যোগে জানিয়ে দিলেন। পরের দিন আবার গভর্ণর সাহেব এই খবরটি ভাইস্‌রয়কে পাঠিয়ে দিলেন। ভাইস্‌রয় এক জরুরী সভা আহ্বান ক'রে ভারতবন সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললেন এবং বিলাতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই খবর পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে বিলাত থেকে পরের দিন সমস্ত বৃটিশ-সাম্রাজ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়লো। প্রধানমন্ত্রী সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন। প্রত্যেক দেশে তাই সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেল। গোপনে-গোপনে তারা যেন যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে শুরু করলে।

পুলিশ-কমিশনার ডক্টর ঘোষকে খুব ধন্যবাদ দিলেন যথাসময়ে সেই সংবাদটি তাঁকে দেবার জন্যে। এবং তাঁকে ব'লে দিলেন, যখন যা দরকার হবে জানাতে। তিনি সকলের প্রথমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। ডক্টর ঘোষ কমিশনার-সাহেবের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে বিদায় নিলেন।

রাত্তির আড়াইটের সময় ডক্টর ঘোষ যখন বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন, পুলিশ-কমিশনারের আদেশমত চারিদিকে কড়া পাহারা রয়েছে। এই দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। কিন্তু চাবী খুলে ল্যাবরেটরী ঘরের ভিতরে ঢুকতেই তাঁর

বুক কেঁপে উঠলো। তাঁর যন্ত্রপাতির কোন চিহ্ন নেই, জানলার গরাদ ভাঙা, চারিদিকে ছেঁড়া তার ঝুলছে, ভাঙা কাঁচ ঘরময় ছড়িয়ে আছে। তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন এবং চেঁচামেচি ক'রে বেয়ারা দারোয়ানকে আগে ডাকলেন। তারা ছুটতে-ছুটতে সেখানে এসে হাজির হলো। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ পাহারাওলারাও ছুটে এলো। কিন্তু কিভাবে চুরি হয়েছে এবং কখন হয়েছে তা তারা কেউ বলতে পারলে না। বাড়ীর ভিতরে, বাগানের মধ্যে, আশেপাশে, চারিদিকে তখন খোঁজ-খোঁজ রব প'ড়ে গেল। ডক্টর ঘোষ টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে এই সংবাদ পুলিশ-কমিশনার সাহেবকে আগে দিলেন।

কমিশনার সাহেব তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন, চিন্তা করবেন না, আমি এখনি কলকাতার সমস্ত থানায় খবর দিয়ে দিচ্ছি, যে কোন লোকের সঙ্গে কোন যন্ত্রপাতি দেখতে পাবে তাকে যেন সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া আমি ইনস্পেক্টারদের ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা গিয়ে ভালো ক'রে খোঁজ-খবর নিয়ে আসুক।

ধন্যবাদ, ব'লে ডক্টর ঘোষ ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

এর মিনিট-পনেরো পরেই মিঃ মুখার্জ্জী সেখানে এসে হাজির হলেন।

ডক্টর ঘোষ আগে অধ্যাপক রাহার স্ত্রীর কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

মিঃ মুখার্জ্জী বললেন, তাঁকে সেই ঠিকানায় পাওয়া গিয়েছে এবং সেখান থেকে এনে তিনি তাঁকে আবার ডক্টর ঘোষের স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। আর যে স্ত্রীলোকটি অধ্যাপকের স্ত্রীকে পাহারা দিচ্ছিলো তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে এনেছে।

যাক, একটা মহা দুর্ভাবনা থেকে ডক্টর ঘোষ নিশ্চিন্ত হ'লেন। তখন তিনি বোরোরার কাছ থেকে যা-যা জানতে পেরেছিলেন, সব মুখার্জ্জীকে বললেন।

মিঃ মুখার্জ্জী বললেন, আপনি ল্যাবরেটরী থেকে বেরুবার আগে যদি পুলিশকে ফোন ক'রে এখানে আনিয়ে রাখতেন তাহ'লে আর এই বিপদ হতো না।

ডক্টর ঘোষ বললেন, এত তাড়াতাড়ি যে কিছু হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। যাক, সে যা হবার হয়েছে, তা নিয়ে ভেবে এখন আর কোন ফল নেই। এই ব'লে তিনি মিনিট-কয়েক চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, এখন বোরোরাকে সংবাদ দেবোই-বা কি ক'রে।

মিঃ মুখার্জ্জী বললেন, কেন, অধ্যাপক রাহার দরুন যে-সব পুরোণো যন্ত্রগুলো গুদামে রয়েছে সেইগুলো এনে কোনরকম এখন একটা ব্যবস্থা করা যাক্।

তাতে খুব স্পষ্ট ক'রে কথা আদান-প্রদান করা না গেলেও,

বোরোরার সান্নিধ্য লাভ করা যেতে পারে। এই মনে ক'রে তারা দুজনে তৎক্ষণাৎ গুদামঘরের দিকে ছুটলেন। কিন্তু দরজার চাবি খুলেই দু'জনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে যে-সব যন্ত্রপাতি ছিল সব টুকরো-টুকরো ক'রে ভাঙা প'ড়ে আছে।

সর্ব্বনাশ! কি ক'রে এখন মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিককে এই সংবাদ দেবেন! ডক্টর ঘোষের মুখ শুকিয়ে গেল। যন্ত্রপাতি কৈ, টাকাই-বা তিনি এত কোথায় পাবেন যে, আবার নতুন ক'রে সব যোগাড় করবেন! মুহূর্ত্তে ডক্টর ঘোষ যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

মিঃ মুখার্জ্জীও ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়! শত্রুরা জানতো যে, মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পারলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে—তাই তারা এই কাজ করেছে।

মিঃ মুখার্জ্জীও তাই ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। তাদের এতদিনের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সব জলাঞ্জলি হয়ে গেল। আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করবার অর্থ যে কি, তা তাঁরা উভয়েই বেশ বুঝতেন। যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। বিলেত, আমেরিকা থেকে অর্ডার দিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া কতকগুলো অংশ আবার হাতে প্রস্তুত করতে হবে, সেও অনেক সময় সাপেক্ষ। অর্থই-বা এত কোথায়? অথচ তা না হ'লে বোরোরার কাছ থেকে পরামর্শই-বা পাবেন কি ক'রে? কি হবে! দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে তাই ভাবতে লাগলেন।

'মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

এমন সময় বাইরে একটা মোটরগাড়ীর শব্দ হলো। ডক্টর ঘোষ তাড়াতাড়ি এসে দেখলেন, সামনে পুলিশ-কমিশনার সাহেব স্বয়ং!

হাসতে-হাসতে কমিশনার সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? আরো কিছু খবর আছে নাকি?

তখন ডক্টর ঘোষ তাঁকে গুদামঘরে নিয়ে গিয়ে সব দেখালেন এবং বললেন, আবার নতুন যন্ত্রপাতি না পেলে মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না—অথচ সে-সব যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না এবং এত টাকাও তাঁর কাছে নেই।

কমিশনার সাহেব বললেন, কুছ পরোয়া নেই, গভর্ণমেণ্ট আপনাকে সব দেবে—কত টাকা আপনার লাগবে একটা হিসাব ক'রে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

এইকথা শুনে মিঃ মুখার্জ্জী ও ডক্টর ঘোষ দু'জনেই আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহে যেন আবার নতুন শক্তি ফিরে এলো।

কমিশনার সাহেব বললেন, আর ইতিমধ্যে যদি আসামী ধরা প'ড়ে যায় ত' ভালই। ব'লে একটু হেসে তিনি প্রস্থান করলেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন কাগজে খবর বেরুলো, জাপান—চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অসহায় ও নিরীহ চীনবাসীদের ওপর জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী প'ড়ে সবাই শিউরে উঠলো। তাদের অতর্কিতে বোমা বর্ষণের ফলেই লোক নিহত হয়েছে এবং বহু ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়েছে। বৃটিশ-প্রজাদের শুধু নয়, বৃটিশ-অধিবাসীদের পর্য্যন্ত তারা অন্যায়ভাবে অপমান করতে ছাড়েনি।

বিলাতের মন্ত্রীসভায় এ-খবর পৌঁছতেই তারা ক্ষেপে উঠলো। জাপানের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য তখন সবাই দৃঢসঙ্কল্প হয়ে সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

এমনি ক'রে চীন-জাপানের যুদ্ধ যখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠলো তখন আবার একদিন সকালে সহসা দেশবাসী বিস্মিত হ'য়ে শুনলে, ইতালী—আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছে। দুর্ব্বল আবিসিনিয়া প্রবলপ্রতাপ মুসোলিনার চাপে ধ্বংস হয়ে গেল।

তার কিছুদিন পরেই আবার জার্ম্মেণী ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠলো। সে পোলাণ্ড আক্রমণ করলে এবং রাক্ষস যেমন টপ্‌টপ্‌ করে এক-একটা লোককে ধ'রে পেটে পুরে ফেলে, তেমনি ক'রে জার্ম্মেণী একটার পর একটা রাজ্য গ্রাস করতে লাগল।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

জার্ম্মেণীর এই প্রতাপ দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো কোন শক্তি এত দ্রুত এতগুলো বড় দেশ জয় করতে পারেনি।

রাশিয়া চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ হতে লাগল। বৃটিশ-সরকারের স্বার্থ নানাস্থানে ব্যাহত হতে লাগল নানাভাবে। তারাও গোপনে-গোপনে যুদ্ধজাহাজ, বিমানপোত, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ তৈরী সুরু করলে, এদিকে স্পেনে গৃহবিবাদ দেখা দিল। তুরস্ক থেকেও নানা অশান্তির সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল। ভারতবর্ষেও নানারকমের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হলো—হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, কংগ্রেসের সঙ্গে ভারত-সরকারের মনোমালিন্য, রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের বিভিন্ন উৎপাত প্রভৃতি। এক-কথায় সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক আলোড়ন দেখা দিল। চারিদিকে শুধু অস্ত্রের ঝনঝনানি। মৃত্যুর কলরোল! মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাত লেগেছে। জীবন নিয়ে যেন ছেলেখেলা চলেছে। পৃথিবীর রণাঙ্গণে একটা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সুরু হলো—আজ এ ওকে মারছে, কাল সে একে মারছে। দুর্ব্বল মার খাচ্ছে প্রবলের হাতে।

হঠাৎ জার্ম্মেণী বৃটিশ-সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে। বিলেতে বোমা ফাটতে লাগল। কত নরনারী নিহত হলো, কত ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হলো। ইংলিশ-চ্যানেলের দু-ধারে কামান গর্জ্জন করতে

লাগল। এদিক থেকে ইংরেজরা ছাড়ে, ওদিক থেকে জার্ম্মেণীরা ছাড়ে। দুই প্রবল শক্তি—একদিকে বৃটিশ-সিংহ, অপরদিকে জার্ম্মেণীর অপরাজেয় শক্তি!

এইভাবে যখন জার্ম্মেণীর রাজ্যলিপ্সা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল তখন রাশিয়াও আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। ভেতরে-ভেতরে সেও বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। কি জানি জার্ম্মেণীর মতিগতি কখন কোনদিকে ফেরে! যদিও রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মেণীর কোন অসদব্যবহার ছিল না, তবুও মদোমত্ত জার্ম্মেণী, রাশিয়ার এই ক্ষমতাবৃদ্ধির আয়োজন দেখে রীতিমত ভীত হয়ে পড়লো এবং পাছে সে কোনদিন তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এই আশঙ্কায় জার্ম্মেণী, রাশিয়াকেও বাদ দিলে না, একদিন অতর্কিতে আক্রমণ করলে। একই সঙ্গে এতগুলো বিরাট রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো অতি কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু জার্ম্মেণীর মাথায় তখন যেন খুন চেপেছে, রক্তের নেশায় সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হয়ে নিরীহ ও অসহায় মানুষকে দিনের পর দিন হত্যা ক'রে চললো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও বোধহয় এত লোক মরেনি। সমস্ত পৃথিবী তাঁর আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। সভ্য-জগতের মাঝে এই রক্ত-পিপাসুর দানবীয় মূর্ত্তি দেখে সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল।

প্রতিদিন নতুন-নতুন হত্যাকাণ্ডের সংবাদে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হয়ে গেল। সমগ্র ইউরোপে যখন এইরকম হত্যাকাণ্ড চলেছে ঠিক সেই সময় জাপান আবার পূর্ব্ব-এশিয়ায়

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সেও জার্ম্মেণীর এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে সুমাত্রা, জাভা, মালয়, শ্যাম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ একটির পর একটি গ্রাস করতে-করতে শেষে প্রবল বিক্রমে বর্ম্মা আক্রমণ করলে।

সভ্যজাতিসমূহ তখন সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল। তারা স্বপ্নেও জানতে পারেনি যে, লেখাপড়া-জানা, শিক্ষিত কোন জাতি এরূপ অসভ্য ও বর্ব্বরোচিত কার্য্য করতে পারে। তবুও তারা যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে বাধা দিলে, কিন্তু কোন ফল হলো না। দানব যখন ক্ষেপে ওঠে তখন স্বর্গের দেবতারাও তাদের ভয়ে পালিয়ে যান। বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর দখল ক'রে আসামের ভিতর দিয়ে জাপানিরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ওদিকে ইরাণ, পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে দিয়ে জার্ম্মেণীরাও ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলো। যেমন ক'রে হোক বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাবে তারা পৃথিবী থেকে।

জাপান ও জার্ম্মেণী মিতালী করেছে, সঙ্গে তাদের দোসর—ইতালী।

আর অপরদিকে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও বৃটেন। যেমন ক'রে হোক এই দানবীয় শক্তির উচ্ছেদ তারা ঘটাবে, এই তাদের পণ। তাতে ধন মান মর্য্যাদা, শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি যায় যাবে, থাকে থাকবে। শত্রু নিধনের জন্যে তারা সর্ব্বস্ব

পণ করলে। পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়, দৈত্যদের অত্যাচারে স্বর্গও মাঝে-মাঝে দেবতাদের নিকট অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। তাদের খেয়ে শান্তি নেই, ঘুমিয়ে শান্তি নেই—দিন-রাত শুধু 'ঐ বুঝি এলো' এই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকত। শেষে, দেবতাদের যিনি দেবতা তাঁর কাছে তপস্যা ক'রে বরলাভ করবার ফলে, স্বর্গভূমি আবার দানবশূন্য হতো, দেবতারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতেন।

সমস্ত পৃথিবীতে যখন সমরানল দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো, তখন ভারতের সমরনায়কেরা ডক্টর ঘোষের স্মরণাপন্ন হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এ পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে এমন কোন শক্তিশালী অস্ত্র আমদানী করতে হবে, যা পৃথিবীর লোকেরা কখনো চোখে দেখেনি, নাম শোনেনি, অথচ—যার আঘাতে শত্রুর পরাজয় সুনিশ্চিত।

মঙ্গলগ্রহ যে বৈজ্ঞানিক-জগতে কিরূপ অগ্রণী তা তাঁরা জানতেন। তাই ডক্টর ঘোষকে তখন একমাত্র পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে বৃটিশ-সরকার মনে করলেন। কিন্তু ডক্টর ঘোষ তখন শক্তিহীন। যন্ত্রপাতির অভাবে তিনি খোঁড়া হয়ে ব'সে আছেন। মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে যে যন্ত্রের সাহায্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা কৈ? সব চুরি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বিলাতে, আমেরিকাতে যে নতুন যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছিলেন তাও এখনো পর্য্যন্ত এসে পৌছয়নি। যে জাহাজে ক'রে তাঁর যন্ত্রপাতি আসছিল, সেই জাহাজখানিই শত্রুরা ডুবিয়ে দিয়েছে। একবার

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

নয়, দু'বার নয়, তিন-তিনবার। তাই ডক্টর ঘোষও মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছিলেন। যন্ত্র কৈ? যন্ত্রের জন্যে তিনি পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলেন, শেষে ভারতবর্ষকে যখন উভয় দিক থেকে সাঁড়াসীর মত চেপে ধরলে এবং ইংলণ্ড, জার্ম্মেণীর বোমায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, সেই সময় যেন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের নিজের অতি সুরক্ষিত বিমানপোত ক'রে ডক্টর ঘোষের যন্ত্রপাতি সব বিলেত ও আমেরিকা থেকে এনে দিলে।

যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছল। চারিদিকে কঠিন পাহারা নিযুক্ত ক'রে তখন ডক্টর ঘোষ ও তাঁর সহকারী বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জী সেই বহু প্রতীক্ষিত যন্ত্রটি সাজিয়ে ফেললেন।

শেষে জার্ম্মেণী যেদিন বেতারের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীবাসীর নিকট ঘোষণা করলে যে, তারা করবে গোটা ইউরোপটাকে জয়—আর জাপান করবে সমস্ত এশিয়াটা—সেদিনই রাত্তির দ্বিপ্রহরের সময় ডক্টর ঘোষ তাঁর ল্যাবরেটরীতে ব'সে প্রথমেই উচ্চারণ করলেন সেই মন্ত্রটি, Hordons grow on the Shore of the Balvian Sea.

একি! কোন উত্তর নেই কেন? ডক্টর ঘোষের বুক কেঁপে উঠলো।

তিনি আবার সেই কথাটি স্মরণ করলেন, কিন্তু এবারেও কোন ফল হলো না।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

শেষে পাঁচমিনিট ধ'রে উপর্য্যুপরি ওই কথাটি জপ করবার পরই হঠাৎ ডক্টর ঘোষের চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠলো। সহসা তিনি দেখলেন, একেবারে বোরারার সামনে ব'সে আছেন মুখোমুখি।

ব্যাপার কি? এতদিন কোথায় ছিলেন? ব'লে বোরোরা তাঁকে প্রথমেই সম্ভাষণ করলেন।

ডক্টর ঘোষ তখন পৃথিবীতে যা-যা ঘটেছিল এতদিন ধ'রে সব তাঁকে বললেন।

বোরোরা সব শুনে বললেন, তাহ'লে আমাকে এখন কি করতে হবে হুকুম করুন।

ডক্টর ঘোষ হাত জোড় ক'রে বললেন, ছি ছি, ও-কথা ব'লে আমার আর পাপ বাড়াবেন না। এখন পৃথিবীর রক্ষার ভার আপনার ওপর। আপনি না কৃপা করলে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে—পৃথিবীতে বোধহয় আর শান্তিই ফিরে আসবে না।

বোরোরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে যেন কি ভাবলেন। তারপর বললেন, এ ত' শুধু বৈজ্ঞানিকদের যুদ্ধ—যার যত অস্ত্রবল ভালো, সেই জয়ী হচ্ছে। আচ্ছা, এই যুদ্ধে আপনাদের ওখানে কি-কি অস্ত্র শত্রুপক্ষ ব্যবহার করছে বলতে পারেন?

ডক্টর ঘোষ বললেন, আজ নয়, কাল আমি সমস্ত বিস্তৃতভাবে বলতে পারবো, গভর্ণমেণ্টের-সৈন্যবিভাগ থেকে সব বিবরণ জেনে এসে।

বোরোরা বললেন, বেশ তাই হবে। আর আমিও একটু

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ভেবে রাখি, কি-রকম অস্ত্র বাতলে দিলে, চট ক'রে আপনারা তৈরী করতে পারবেন, আর তার দ্বারা শত্রুনিধনও খুব সহজ হবে।

পরদিন ডক্টর ঘোষ মিঃ মুখার্জ্জীকে সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন জাপানী ও জার্ম্মাণীদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রকৃতি জানবার জন্যে। তারপর রাত্রে তিনি সেইগুলি বোরোরাকে বিস্তৃতভাবে বললেন।

বোরোরা শুনে হাসতে লাগলেন।

ডক্টর ঘোষ বললেন, আপনি হাসছেন কেন?

বোরোরা বললে, ছেলেরা যখন টিনের তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে, তা দেখে যেমন প্রকৃত যোদ্ধাদের মনের ভাব হয়, আমার তেমনি হচ্ছে।

বিস্মিত হ'য়ে ডক্টর ঘোষ বললেন, সে কি! লক্ষ-লক্ষ লোক যে অস্ত্রে মৃত্যুবরণ করছে, তাকে আপনি ছেলেখেলা মনে ক'রে হাসছেন?

হ্যাঁ, তাই। কেননা, এক হাজার বছর আগে মঙ্গলগ্রহে এইসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হতো। এখন এখানকার অস্ত্র এত এগিয়ে গিয়েছে যে, পৃথিবীর লোক তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে, হয়ত বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু নেই—আজ যাকে অসম্ভব ব'লে মনে হয়, কাল তা প্রত্যক্ষ ক'রে

সবাই বিস্মিত হয়। কাজেই, আজ যারা সমস্ত পৃথিবীকে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের জব্দ করতে কতক্ষণ ?

ডক্টর ঘোষ ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, জব্দ হবে তারা ?

নিশ্চয়ই ! আর কিসে হবে তাও ব'লে দিচ্ছি। অথচ মঙ্গলগ্রহের এ অতি তুচ্ছ অস্ত্র—তবুও এরি বলে সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠবে। তবে দেখবেন, অনাবশ্যক নরহত্যা করবেন না যেন। কিংবা অপ্রয়োজনে ব্যবহার করবেন না। আমি শুধু শত্রুনিধনের জন্যে এই অস্ত্র আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

এই ব'লে বোরোরা একরকমের অদ্ভুত 'সন্ধানী আলো' তৈরী করবার প্রথা ডক্টর ঘোষকে ব'লে দিলেন। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে অতি তীব্র নীলরঙের আলো জ্বলে উঠবে, আর তার রশ্মি যার ওপর গিয়ে পড়বে, সঙ্গে-সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এত প্রবল শক্তি এই আলোক-রশ্মির !

ডক্টর ঘোষ ও মিঃ মুখার্জ্জী তখন সেই অদ্ভুত আলোক-রশ্মি প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। এর জন্যে বিশেষ নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হলো না। তাঁদের কাছে যা ছিল তাই যথেষ্ট !

এদিকে জার্ম্মেণী ও জাপানীদের নৃশংসতা ক্রমশই এত বেড়ে উঠলো যে, পৃথিবীর সভ্য জাতিরা কম্পিত-কলেবরে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগল। বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ বোমা ছেড়ে নাকি তারা রাশিয়ায় ও বর্ম্মায় বহু গ্রাম শ্মশানে পরিণত করছে খবর এলো।

কি উপায়ে এদের প্রতিহত করা যাবে, তাই নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা তখন বিব্রত হয়ে পড়লেন।

ডক্টর ঘোষ বৃটিশ-সরকারকে জানালেন, আর একটা মাস কোন-রকমে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলে আর ভাবনা নাই, তিনি এমনি অস্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন যার দ্বারা জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

বলাবাহুল্য, এই সংবাদে সবাই আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু আর যে রাখা যায় না শত্রুদের ঠেকিয়ে।

ওদিকে তারা বিপুল রুশ-সাম্রাজ্যকে প্রায় শেষ ক'রে আনলে—লেলিনগ্রাদ থেকে মাত্র শত্রু-সৈন্য পঞ্চাশ মাইল দূরে। ইংল্যাণ্ডেও শত্রুর বোমা অশ্রান্তবর্ষী—ভেঙে-চুরে সব তচনচ ক'রে দিলে—প্যারাসুটধারী-সৈন্যরা বারবার সেগুলোর ওপর নামবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে সুশিক্ষিত বৃটিশ-সৈন্যদের অপূর্ব্ব রণকৌশলে।

আর ভারতবর্ষ, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের যা শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ—যার মাটিতে সোনা, বৃক্ষলতায় কোটি-কোটি নর-নারীর অন্ন, নদীর জলে অমৃতধারা, যাকে পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয়না, তারি জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে শত্রুরা।

জার্ম্মেণীর বোমা, করাচীতে পড়লো। জাপানীরা সিংহল, মাদ্রাজ, ও ভিজাগাপট্টম আক্রমণ করলে। নিরীহ ভারতবাসীরা

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল কুকুর-বেড়ালের মত। সরকার থেকে ডক্টর ঘোষের কাছে সংবাদ আসতে লাগল, আর কত দেরী ?

হ'য়ে এসেছে, আর দেরী নেই। চারদিন মাত্র বাকী। ডক্টর ঘোষ ব'লে পাঠালেন।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু শেষদিন আর কাটলো না। চতুর্থ দিন কলকাতায় বোমা পড়লো। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এসে হাজার-হাজার জাপানী-সৈন্য অবতরণ করলে। তারা মোটরে, সাইকেলে, বিমানপোতে কলকাতার আকাশ বাতাস ও মাটি কাঁপিয়ে তুললো।

ভারতীয়-সৈন্যরা বৃটিশ-সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত রণকৌশল দেখাতে লাগল বটে, কিন্তু রণনিপুণ জাপানী-সৈন্যদের প্রবল বিক্রমের কাছে তারা হটে যেতে লাগল।

বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে ক্রন্দনধ্বনি উঠলো

এমন সময় সহসা তীব্র নীলরঙের আলো তীরের মত অন্ধকার ভেদ ক'রে আকাশের দিকে ছুটলো। কোথায় জাপানী বিমান পোত ? যার ওপর সেই আলো গিয়ে পড়ে অমনি সে জ্বলতে-জ্বলতে নীচে পড়ে যায়। এ আলোর সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে শত-শত জাপানী বিমান-পোত সেই আলোক লক্ষ ক'রে তেড়ে এলো। কিন্তু যে আসে সেই এর অব্যর্থ আলোক-রশ্মিতে জ্বলে পুড়ে মরে যায়।

এক রাত্রে জাপানীদের পাঁচশো বিমানপোত ধ্বংস হলো।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

বাংলার আকাশ যখন নিস্তব্ধ হলো, তখন সেই অদ্ভুত সন্ধানী-আলো নিয়ে একটা বিমানপোতে ক'রে ডক্টর ঘোষ ওপরে উঠলেন এবং সেখান থেকে নীচে আলো ফেলে জাপানীদের স্থল-সৈন্যদের ধ্বংস করতে লাগলেন।

এইভাবে মাত্র দু'দিনে বাংলাদেশ থেকে জাপানী-সৈন্যের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বাংলার গভর্ণর নিজে ছুটে এলেন ডক্টর ঘোষকে অভিনন্দিত করতে। তখন আরো বহু বিমানপোতে ডক্টর ঘোষ সেই অদ্ভুত সন্ধানী-আলো সংযুক্ত ক'রে দিলেন। এবং তাদের পাঠিয়ে দিলেন করাচীর দিকে। দানবের মত জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে ছুটলো সেই বিমানপোতগুলি।

সেখানেও সেই একই অবস্থা হলো। জার্ম্মানী-সৈন্যরা একদিনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এমনি ক'রে শত্রুর আক্রমণ থেকে ভারত মুক্ত হলো।

ডক্টর, বোরোরাকে প্রত্যেকদিনের সাফল্যের কথা জানাতেন। বোরোরা সব শুনে খুবই খুশী হলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ডক্টর ঘোষকে সাবধান ক'রে বললেন, এখনো বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি। জাপান ও জার্ম্মাণীর বহু ডুবো-জাহাজ ভারতবর্ষকে ঘিরে রেখেছে। তাদের মারতে হবে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ডক্টর ঘোষ বললেন, কিন্তু এই সন্ধানী-আলো জলের মধ্যে কেমন ক'রে পাঠাবো ?

বোরোরা একটু হেসে বললেন, এই আলো কি জলের ভিতর পাঠানো যায় ? এর জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে এক-রকমের 'ডেপথ্‌চার্জ্জ' আমরা ব্যবহার করি, যার একটা পড়লে জলগর্ভে দশমাইল দূরত্বের মধ্যে যে-কোন ডুবোজাহাজ থাকুক-না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই ব'লে, কি ক'রে সেটা তৈরী করতে হয় ডক্টর ঘোষকে তিনি তা ব'লে দিলেন।

ডক্টর ঘোষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে, মিঃ মুখার্জ্জীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুর গান-ফ্যাক্টরীতে গিয়ে হাজির হলেন। এবং অন্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে তখনি সেই জিনিষটা তৈরী করতে হুকুম দিলেন। অবশ্য, কি ভাবে কি করতে হবে, তিনি সর্ব্বদা সেখানে উপস্থিত থেকে কারখানার বৈজ্ঞানিকদের দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

সাতদিনের মধ্যে এই জিনিষটা তৈরী হয়ে গেল। তখন বিমানপোতে ক'রে সেইগুলি নিয়ে ওপরে উঠে ডক্টর ঘোষ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এক-একটা বোমা পড়ে, আর ভীষণ শব্দ ক'রে সমুদ্রের জল লাফিয়ে ওঠে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে। ওঃ, কি বিকট আওয়াজ। কানে যেন তালা লেগে যায়।

এইভাবে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর এবং ভারতমহাসাগরের

বহুদূর পর্য্যন্ত 'ডেথ্‌থ্‌চার্জ্জ' নিক্ষেপ করার ফলে ভারত একেবারে শত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

চারিদিক থেকে তখন ডক্টর ঘোষের নামে জয়ধ্বনি উঠলো। ভারতের বড়লাট থেকে শুরু ক'রে, সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাঁকে অসংখ্য প্রশংসায় বিভূষিত করলেন।

কিন্তু ডক্টর ঘোষের তখনো আনন্দ করবার সময় আসেনি। তিনি বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিরাট এক বাহিনী তখন ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে কতকগুলো বিমানপোত সেই অদ্ভুত সন্ধানী-আলো নিয়ে ছুটলো, আর কতকগুলো সেই 'ডেথ্‌থ্‌চার্জ্জ নিয়ে ছুটলো—ইংল্যাণ্ডের দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে আরো একদলকে ডক্টর ঘোষ রাশিয়ার দিকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন।

———

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের যেদিন সবচেয়ে বেশী বিপদ—মানসম্ভ্রম সমস্ত শত্রুদের হাতে যায়-যায়, সেদিন রাত্রে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত সেখানকার আকাশে সেই তীব্র সন্ধানী-আলো জ্বলে উঠলো। মনে হলো, যেন কোন অলোকপুরী থেকে অন্ধকার ভেদ ক'রে দলে-দলে সব দেবতারা নেমে এলো। জার্ম্মাণ বিমানপোতগুলি একে-একে সেই তীব্র আলোর স্পর্শেই মৃত্যুকে বরণ করতে লাগল।

এদিকে আবার বোমারু বিমান থেকে যে-সব 'ডেপথ্ চার্জ্জ' সেখানকার সমুদ্রগর্ভে পড়তে লাগল, তারই প্রবল আঘাতে শত্রুদের ডুবোজাহাজগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

এইভাবে অল্পদিনের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার শত্রু নিধন হলো। তারা জার্ম্মাণীর আক্রমণ থেকে মুক্ত হলো। দীর্ঘদিনের পর আবার সেখানকার ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠলো, লোকের মুখে হাসি ফুটলো, তাদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো।

ব্রিটিশজাতির এইরকম ভয়ানক যন্ত্রপাতির পরিচয় পেয়ে শত্রু-পক্ষ রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। তারা তৎক্ষণাৎ সন্ধি করতে রাজী হলো এবং বললে, যে-সব দেশ তারা জয় করেছে, বিনাসর্ত্তে সেগুলি এখুনি ফিরিয়ে দেবে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এইরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র যাদের হাতে আছে তারা ইচ্ছা করলেই সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ভারতবর্ষে যখন সেই সংবাদ এসে পৌঁছলো তখন ডক্টর ঘোষ সত্যিকারের আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁরি ঐকান্তিক চেষ্টায় যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মুখরক্ষা হয়েছে, এ-কথা জানিয়ে বিলাত থেকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নিজে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ভারতবর্ষেও বড়লাট, ছোটলাট থেকে শুরু ক'রে, সৈন্যবিভাগের বড়-বড় কর্ম্মচারীরা তাঁকে অসংখ্য প্রশংসাবাণী শোনালেন।

ডক্টর ঘোষ তখন বোরোরাকে বললেন, এসব আপনারই প্রাপ্য। আপনারই পরামর্শমত আমি করেছি। আমি আপনার আজ্ঞাবাহক মাত্র।

বোরোরা বললেন, আপনি একান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন বলেই আমাকে পেয়েছিলেন, আপনার প্রচেষ্টার এই পুরস্কার। আমার এতে কি? আরো ত' কত বৈজ্ঞানিক রয়েছেন পৃথিবীতে, কই, আর কেউ ত' আপনার মত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মঙ্গলগ্রহের সন্ধানে মাথা ঘামাননি! কাজেই এর সবটুকু সম্মান আপনারই প্রাপ্য।

এর কয়েকদিন পরে ডক্টর ঘোষের সম্মানে 'গভর্ণর-হাউসে' এক ভোজের আয়োজন হলো। ঐদিন বড়লাট নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

এই সংবাদ শুনে ভারতবর্ষের সমস্ত খবরের কাগজ উল্লাসে মুখর হয়ে উঠলো। কাগজের পাতায়-পাতায় বেজে উঠলো ডক্টর ঘোষের জয়ধ্বনি।

সেইদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় ডক্টর ঘোষ সেজেগুজে যেমন মোটরে উঠতে যাবেন, অমনি ফট্ ফট্ ক'রে দু'টো আওয়াজ হলো। সোঁ ক'রে একটা গুলি তাঁর মোটরের ছাদ ভেদ ক'রে চলে গেল, আর-একটা কোথা থেকে এসে একেবারে ডক্টর ঘোষের হাতে লাগল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন।

তাঁর পাশেই ছিলেন মিঃ মুখার্জ্জী। তিনি 'খুন! খুন!' ব'লে চীৎকার করতে লাগলেন।

তখনও বহু পুলিশ পাহারা ছিল ডাক্তার ঘোষের বাড়ীতে। তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো, যেদিক থেকে গুলির আওয়াজ এসেছে সেই দিক লক্ষ্য ক'রে। পুলিশের বাঁশী এদিক-ওদিক চারিদিকে তৎক্ষণাৎ বেজে উঠলো। ধর্! ধর্! ক'রে একটা কলরব প'ড়ে গেল চারিদিকে।

কিছুক্ষণ পরে রিভলভার হাত একটি বাঙালী যুবক ধরা পড়লো। পুলিশেরা তাকে বেশ ক'রে বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে লালবাজার থানায় নিয়ে গেল।

মিঃ মুখার্জ্জী ডক্টর ঘোষকে তৎক্ষণাৎ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন এবং গভর্ণর-হাউসে টেলিফোন ক'রে সেই সংবাদ জানিয়ে দিলেন

. মঙ্গলগ্রহের বৈ

পরদিন খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হলো যে, ধৃত আসামী পঞ্চম বাহিনীর নেতা। শত্রুপক্ষ তাকে প্রচুর টাকা দিয়েছে শুধু ডক্টর ঘোষকে হত্যা করবার জন্যে। বলা বাহুল্য, গোয়েন্দারা এতদিন ধ'রে চেষ্টা করেও সেই অপরাধীদের সন্ধান করতে পারেনি! কারা অধ্যাপক রাহাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল, কারা তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেছিল, কারা ডক্টর ঘোষের লেবরেটরী থেকে যন্ত্রপাতি চুরি করেছিল—তখনো পর্য্যন্ত তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, তার পিছনে যে একটা বিরাট বাহিনী কাজ করছে সে-সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ ছিল না।

ওদিকে শেঠ ধনীরাম আগরওয়ালাকেও কেউ ধরতে পারেনি, ঠিক সময়ে সেও যে কোথায় আত্মগোপন করেছিল কেউ জানে না। তার ওপর যুদ্ধের হাঙ্গামায় এতদিন সব জিনিষটা আরো জটিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তবুও গোয়েন্দাবিভাগের তৎপরতার অভাব ছিল না। তাই এতদিন পরে হাতে-হাতে আসামীকে ধরতে পেরে তারা উঠে-পড়ে লাগল, তার কাছ থেকে দলের সন্ধান নেবার জন্য।

গোয়েন্দা-বিভাগে নানারকম শাস্তি দিয়ে আসামীর কাছ থেকে কথা বার করবার প্রথা প্রচলিত আছে, এ-খবর সবাই জানে। কিন্তু এইভাবে বহু অত্যাচার করেও যখন কোন সংবাদ

মিললো না, তখন প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে গোয়েন্দা-বিভাগ সেই আসামীকে হাত করলে। তারা বললে, বাঙালীর ছেলে হ'য়ে যখন শুধু টাকার জন্যে এত-বড় একজন বাঙালী-বৈজ্ঞানিকের প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছো, তখন এর দশগুণ টাকার বিনিময়ে কেন সেই বাংলার শত্রু, ভারতের শত্রু, পৃথিবীর শত্রুদের ধরিয়ে দেবে না? কত টাকা তোমার চাই, এই নাও—আর এই আমরা তোমার মুক্তিপত্র লিখে দিচ্ছি—দেশের এই পরম শত্রুদের ধরিয়ে দাও। আমরা জানি যে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে।

এই ব'লে গোয়েন্দা-বিভাগের বড়সাহেব তার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা তোড়া দিলেন ও তার সঙ্গে একটা মুক্তিপত্র লিখে দিলেন।

আসামী, শিক্ষিত বাঙালী যুবক। গোয়েন্দাবিভাগের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলেও হঠাৎ কেমন তার মনে একটা আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো। সে ভাবলে, মরতে ত' যাচ্ছিই, তার আগে আমি যা জানি তা ব'লে দিয়ে দেশের উপকার ক'রে যাই।

এই ব'লে আসামী তাদের প্রধান আড্ডার সন্ধান দিয়ে দিলে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে দলে-দলে পুলিশবাহিনী মোটরে ক'রে ছুটলো যশোরের দিকে এবং এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে একটি

ভাঙাবাড়ী তারা ঘেরাও করলে।
সেখানে চারটি লোক ধরা পড়লো।
তার মধ্যে, শেঠ ধনীরাম প্রধান।
তিনি একটা ছোট্ট বেতার যন্ত্রের কাছে
মুখ লাগিয়ে তখন সংবাদ প্রেরণ করছিলেন
জার্ম্মানী ও জাপানে। হঠাৎ চোখ তুলে চারিদিকে
রিভলভারধারী পুলিশ-কর্ম্মচারীদের দেখে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

তখন সেই ভাঙা বাড়ীর চারিদিক তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে গোয়েন্দারা একটি ছোট্ট খাতা, কয়েকটি বেতার যন্ত্র ও গোটা-তিরিশ রিভলভার আবিষ্কার করলে। বেতার যন্ত্র ও রিভলভারগুলি সব জাপানীদের তৈরী। আর সবচেয়ে মূল্যবান হলো সেই খাতাটি! তাতে আশীজন বৈজ্ঞানিকের নাম ও ঠিকানা লেখা—জার্ম্মানীর চল্লিশজন, জাপানের তিরিশজন ও ইটালীর দশজন।

* * *

ওদিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠানে শত্রুপক্ষদের কথামত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার আগে এক জরুরী বৈঠক বসলো। সভাপতি তাতে এই মর্ম্মে শত্রুপক্ষের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নলিখিত আশীজন বৈজ্ঞানিককে এখানে হাজির করতে হবে। লীগের বিচারে তাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। এদেরি প্ররোচনায় এই যুদ্ধের সৃষ্টি

এবং লক্ষ-লক্ষ নিরীহ নরনারীর মৃত্যুর কারণ এরাই। এই-সব বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন অস্ত্রব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যুদ্ধ চললে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের বিক্রি বাড়বে ও প্রচুর লাভ হবে ব'লে তারা এই যুদ্ধ বাধিয়েছে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যারা পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ নরনারীর মৃত্যু কামনা ক'রে, তাদের একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। তাদেরই রক্তে পৃথিবীর কলঙ্ক ধুয়ে যাবে, তবে আবার নূতন রূপে শান্তি ফিরে আসবে পৃথিবীতে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠানের এই আদেশ পরাজিত সব জাতিই মেনে নিলে। তারা নিজ-নিজ দেশের বৈজ্ঞানিকদের তখন সেখানে এনে হাজির করলে।

বিচারের দিন ঠিক হলো। 'স্পেশাল ট্রাইবুনাল' বসলো। সবদেশের খ্যাতনামা বিচারকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে তাদের ওপরে এই বিচারের ভার দেওয়া হলো।

বিমানপোতে ক'রে দেশ-বিদেশ থেকে এইসব প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বিচারকরা এসে সম্মিলিত হলেন সেখানে।

সারা পৃথিবীতে এই নিয়ে একটা হুলুস্থূল পড়ে গেল। একদিন, দুদিন, তিনদিন করতে-করতে কেটে গেল তিনমাস। প্রত্যেক দেশের অপরাধীদের জন্যে বিচার করতে ব'সে আইনের নানা ধারার নানা উল্লেখ ক'রে বিচারকরা যেসব রায় দিলেন তাতে বিরাট-বিরাট পুঁথির সৃষ্টি হয়ে গেল। প্রত্যেক বিচারকই নিজস্ব মত ব্যক্ত করলেন স্বতন্ত্র-

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

ভাবে। শেষে সকল বিচারকের রায় দান শেষ হলে—তখন চরম বিচারের দিন ঠিক হলো।

পৃথিবীর নানা দেশের নানা খবরের কাগজে সেই খবর বড়-বড় হরপে ছাপা হলো।

ডাক্তার ঘোষের চোখে সেই খবর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি একটা চিঠি লিখে জেনেভায় যাবার একটা পাশপোর্ট সরকারী দপ্তর থেকে আনিয়ে নিলেন। ডক্টর ঘোষ চিঠিতে লিখেছিলেন, বিশেষ দরকার, পাশপোর্ট আজই চাই এবং কালই তিনি রওনা হতে চান বিমানযোগে অত্যন্ত জরুরী কাজে।

বলা বাহুল্য, সরকার থেকে তখনি সে ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরে তিনি দমদম বিমানবিমান ঘাঁটী থেকে যাত্রা করলেন।

জেনেভায় গিয়ে যেদিন পৌঁছলেন সেইদিনই যুদ্ধাপরাধী বৈজ্ঞানিকদের বিচারের চরম ফলাফল বেরুবে!

বিচারকমণ্ডলীর যিনি সভাপতি, তিনি যখন সেই দণ্ডাদেশ পাঠ করছিলেন তখন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠানের সেই বিরাট হল-ঘরটির মধ্যে একটা নিরবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কোথাও টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত ছিল না। এতবড় একটা কাণ্ড যে ওরা

মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা বাইরে থেকে কি, ঘরের ভিতরে ঢুকলেও বোঝা যায় না। সবাই গম্ভীর মুখে পাথরের মূর্ত্তির মত বসেছিলেন স্তব্ধভাবে। মাঝখানে শুধু বড় উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম্ম, তার উপর তিনটে মাইক্রোফোন-যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর শেষ বিচারের বাণীটি পাঠ করছিলেন। সেই বিরাট হল-ঘরটি তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজে শুধু গম্‌গম্‌ করছিল।

চরম শাস্তির বাণীর সর্ব্বশেষ কথাটি যখন প্রেসিডেণ্ট উচ্চারণ ক'রে বললেন, অবশ্য সব বিচারক একমত না হলেও বেশীর ভাগ বিচারকই একমত যে, এইসব বৈজ্ঞানিকের দ্বারাই যেসব ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরী হয়েছে, তারি ফলে দেশে-দেশে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এদের প্রাণের জন্য এই ক'জন বৈজ্ঞানিকই প্রধানত দায়ী। তাই অধিকাংশ বিচারকদের মতানুসারে আমি এঁদের এই আশিজন বৈজ্ঞানিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছি।

এই কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর ঘোষ নাটকীয়-ভাবে উপস্থিত হয়ে বললেন, অসম্ভব বিচারের নামে এতবড় অন্যায় আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তাই আমি এর প্রতিবাদ করবার জন্যে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এইমাত্র ছুটে এসেছি। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির শ্রেষ্ঠ বিচারকমণ্ডলী এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সামনে আমি সামান্য কয়েকটা কথা শুধু বলতে চাই—তাই প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে আমি

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিক

কয়েক মিনিট মাত্র সময় প্রার্থনা করছি।

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত হলের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনি কে এবং কোন অধিকার বলে এই অন্যায় আবদার করছেন আগে আমি তাই জানতে চাই।

ডক্টর ঘোষ তখন প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর উঠে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের সিলমোহর করা একটা খাম তাঁর হাতে দিলেন।

চিঠিটা পড়েই তিনি ব'লে উঠলেন, ওঃ আপনি ডক্টর ঘোষ?

হ্যাঁ। ব'লে ডক্টর ঘোষ ঘাড়টা যেমন বিনয়ে নীচু করলেন, তখনি প্রেসিডেন্ট মাইকের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বন্ধুগণ, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর ঘোষ এখানে এসেছেন, এবং তিনি দু'চারটি কথা আপনাদের সামনে এখনি বলবেন। আশা করি আপনারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

সঙ্গে-সঙ্গে করতালি ধ্বনিতে সমস্ত হলটা মুখরিত হয়ে উঠলো।

ডক্টর ঘোষ তখন মাইকের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বন্ধুগণ, আমার মনে হয়, আজ বৈজ্ঞানিকদের যে বিচার এইমাত্র হলো, তার চেয়ে ভুল কাজ আর কিছুই হতে পারে না!

কেননা যে-বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক থেকে এইসব অদ্ভুত-অদ্ভুত মারণাস্ত্র বেরিয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদেরই মস্তিষ্ক থেকে আবার এমন-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হ'তে পারে, যা পৃথিবীর কোটী-কোটী লোকের কল্যাণ সাধন করবে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যরা তখন ডক্টর ঘোষকে অনেক বোঝালেন এবং এ অনুরোধ প্রত্যাহার করতে বললেন।

কিন্তু ডক্টর ঘোষ নিজের প্রতিজ্ঞায় অচল-অটল হয়ে রইলেন। তিনি বললেন, আপনারা আমাকে যে সম্মান ও উপহার দিয়েছেন, আমি সসম্মানে সে সমস্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি, শুধু তার বদলে আমি পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। তারা সকলে আমার ভাই। এ অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।

অগত্যা ডক্টর ঘোষের কথাই রইল। যিনি সমস্ত পৃথিবীকে আজ ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইবার সাধ্য আছে কার।

ডক্টর ঘোষের এই মহানুভবতা দেখে পৃথিবীর লোকেরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিশেষ ক'রে জার্ম্মানী, জাপান এবং ইটালী। তারা ডক্টর ঘোষকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে এবং তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার তোড়া উপহার দিলে।

মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞা

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। আবার দেশে-দেশে আনন্দের বাজনা বেজে উঠলো। বন্ধুত্বের সূচনা হলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
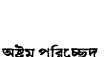
ডক্টর ঘোষ কলকাতায় ফিরে এসে লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে অধ্যাপক রাহার নামে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক-গবেষণাগার নির্ম্মাণ করালেন। এখানে যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তার সমস্তটা এলো বাইরে থেকে। কিছু পাঠালে জার্ম্মানী, কিছু জাপান, কিছু ইটালী, কিছু ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট।

এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। তাঁরা লণ্ডন থেকে কলকাতায় এলেন বিশেষ ক'রে এই উপলক্ষে। এছাড়া পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের ডক্টর ঘোষ এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই এসেছিলেন ডক্টর ঘোষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পৃথিবীতে এরকম ঘটনা আর কখনো হয়নি।

ডক্টর ঘোষ সেইদিন সকলের সামনে যন্ত্রযোগে তাঁর সেই অদ্ভুত আবিষ্কার, মঙ্গলগ্রহের বৈজ্ঞানিককে দেখালেন এবং সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।
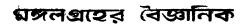
সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে বোরোরা অভিবাদন জানালেন। তাঁরাও কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বার-বার তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তারপর বোরোরা পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের নমস্কার ক'রে বললেন—Goodbye Brothers!

এই বলার সঙ্গে-সঙ্গে বোরোরার মূর্ত্তি আবার সকলের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

শেষ